ছোটদের
বইয়ের
স্বপ্নরাজ্য

শৈব্যা প্রকাশন বিভাগের নতুন ঠিকানা
৩৬/১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৯

৪·৮

৪৬৮

ছাত্র ঘড়ি

অ্যাডভান্স

পলিটাগচি

Code No A·8
SL No 49

Acc No. 15097

৪৬৮

ছাত্র দর্পণ

আশুতোষ

মণি বাগচি

ঈশান পুস্তকালয়
৮/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

আশুতোষ যে সকল স্বপ্ন দেখিতেন, তাহা সংসারের ভিড়ে খুঁজিয়া তিনি সফল করিতে পারিতেন। তাঁহার স্বাস্থ্যের উপর একটা প্রত্যয় ছিল যে তিনি বিলম্বী হইবেন – ইহা জানিয়াই তিনি কর্মের পরিকল্পনা করিতেন, তাঁহার সংকল্পগুলি বৃহৎকায়ের পক্ষ-স্বরূপ ছিল। আশুতোষ একদিকে ছিলেন প্রচণ্ড কর্মবীর, অন্যদিকে অবসরবিনোদক। কথা আর বলিব না – এই দুইটি মিলাইয়াই তো আশুতোষ। একদিকে তিনি যেমন ছিলেন অসুরশক্তির আধার, অন্যদিকে তেমন তিনি ছিলেন সকলের সুযশস্বী সুহৃদ্‌বর। তাঁহারই নেতৃত্বে বন্ধুবর এই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় একদা কী উজ্জ্বল শ্রী ধারণ করিয়াছিল, তাহা যে ইতিহাস সকলে স্মরণ করিলেই আশুতোষের কর্মশক্তি ও মনস্বিতার পরিচয় পাইয়া [redacted] বিস্মিত হইতে হয়।

— রবীন্দ্রনাথ

বিদ্যাসাগরের পরেই আশুতোষ।

সেই পৌরুষ, সেই তেজ, সেই চরিত্র আর সেই বিরাট ও অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব।

আমাদের দেশে শিক্ষা, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের ইতিহাসে, তাঁর কর্মশক্তির তুলনা নেই। জ্ঞান দান শ্রেষ্ঠ দান। আশুতোষ আকৃষ্ট হলেন এই জ্ঞান দান করেই দেশবাসীর শ্রদ্ধা অর্জন করেছেন — অমরত্ব লাভ করেছেন ইতিহাসে।

আশুতোষের জীবন যে কালের ছাত্রদের আজ সেই আদর্শ জীবন। সততা ও সাধনার অনন্যসাধারণতায় সমৃদ্ধ ছিল তাঁর জীবন। তোমরা বড়ো হয়ে তাঁর বিষয়ে আরো অনেক কিছু জানতে পারবে — এই বইতে তোমরা যেটুকু পাবে তেমন উজ্জ্বল ছিল তাঁর ছাত্রজীবন। তাঁর অল্প কিছু গুণ যদি তোমরা হতে পারো, তাহলেই সার্থক হবে তোমাদের জীবন।

আনন্দ বাগচি

॥ এক ॥

- মা, সরকার আমাকে একটা বড়ো চাকরিতে নিযুক্ত করেছেন।

- কি চাকরি? কোথায়?

- জজের চাকরি। আমাকে হাইকোর্টের জজ করা হয়েছে।

- কে বললো?

- কলকে আবার কে? এই দ্যাখো লিখে পাঠিয়েছে।

- নিতাই-দা?

- হ্যাঁ মা। এই যে চিঠি, লাট সাহেবের সই-করা।

- কিন্তু এ চাকরি তোর নেওয়া হবে না। তুই চাকরি করবি - এই যে আমি বারণ করছি পারবি না।

- কেন মা? বাবা বলতেন চাকরি যদি করতে হয় তবে হাইকোর্টের জজ ছাড়া অন্য চাকরি তোর আমি না গ্রহণ করি।

- তবু চাকরি তো।

- হাইকোর্টের জজের চাকরি অবহেলার নয় মা। তুমি ভুল করো।

অনিদ্রা সত্ত্বেও মা রাণী হলেন। খুব জোরে পদ গ্রহণ করলেন।

এই মা জগতারিণী দেবী।

এই খুব স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়।

এঁকেই বলা হতো রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার - বাংলার বাঘ। ইনি একদিকে বাংলার ছেলে ছিলেন, ছিলেন বাংলার গিরি। এঁর জীবনকথাই তোমাদের বলছি।

#space#

এর পশ্চিম তীরে হুগলি কলেজ।

এইখানেই শ্রীরেট-বলাড়ের মুখুয্যে-বংশ বাস্তুন-পণ্ডিতের বংশ। অনেক কাল আগে তাঁদের পদবি ছিল 'মুখের মুখুটি বাঁশ'। কবি মুক্তিবশে কহিতেন এই বংশ।

পূর্ব রেলপথের খন্যান স্টেশন থেকে তিন-চার ক্রোশ দূরে এক গ্রাম। গ্রামটির নাম দিগাসুই। সেইখানে বাস করতেন এক ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁদের উপাধি মুখোপাধ্যায়। এই বংশের কেউ কেউ প্রত্যুক্তে পণ্ডিত বলে ন্যায়ালঙ্কার, বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়রত্ন প্রভৃতি সম্মানসূচক উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। গ্রামের সকলেই এই বংশের ব্রাহ্মণের বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন।

এই পরিবারে রামরাম ন্যায়ালঙ্কার বর্ধমানে ছিলেন।

তাঁর তিন ছেলে — হরেকৃষ্ণ, রামজয় ও রামকৃষ্ণ।

১৭৮৭ সালের ১৮ই অক্টোবর রামজয়ের এক পুত্রসন্তান জন্মায়। এই ছেলের নাম বিশ্বনাথ। ছেলের জন্মের অল্পদিন পরেই রামজয় প্রথমা শিশুপুত্র ও পত্নী রেখে অমরলোকে চলে যান। তখনো রামজয়ের বয়স ত্রিশ পেরোয়নি। তাঁর আর এক ভাইও তখন জীবিত ছিলেন না। ফলে অসীম শোক, তার ওপর জ্যেষ্ঠ ভাতৃবধূ ও ভাইপোর ভরণপোষণ, রামজয়ের স্ত্রী নিরুপায় হয়ে খুব অসহায় বোধ করলেন। কিছুদিন এভাবে চলার পর একরকম বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর মৃতপতির ভিটে ছেড়ে বাপের গ্রামে শিশুপুত্রকে নিয়ে চলে গেলেন।

তবে তিনি সেখানেই ছিলেন, শ্বশুরবাড়ি দিগাসুইতে আর আসেন নি। শ্বশুরও তাঁকে আনতে চেষ্টা করেননি; তাঁর সঙ্গে তাঁর দেখা পর্যন্ত হয়নি। এইভাবে স্বামীর সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত আর পিতৃ-পিতামহের দেশ থেকে একরকম নির্বাসিত হয়ে রামজয় আবার বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলেন। তাঁর এক

মামা ও দিদিমা ছিলেন। তাঁরা গরীব, তাই বিশ্বনাথের ছেলেবেলা খুব সুখে কাটেনি। তবে এখানে তাঁর স্নেহ যত্ন আদরের অভাব ছিলনা। এইজন্যে বিশ্বনাথ মামা ও দিদিমার স্নেহের বেষ্টনে সন্তুষ্ট হয়ে উঠলেন। তাঁর মামা তাঁকে পাঠশালায় ভর্তি করে দিলেন। সেইত বাংলায় অঙ্ক সংস্কৃতি যা তখন পড়ানো হত সে শিখেছিলেন। তিনি যেমন বুদ্ধিমান তেমনি সরল উদারপ্রকৃতি ছিলেন। খুব কম বয়স থেকেই বিশ্বনাথ উপার্জন করতে আরম্ভ করেন ও তাঁর মায়ের দুঃখ মোচন করতে থাকেন। তিনি খুব আত্মভক্ত ছিলেন। যা যাতে সুখী হয়, তৃপ্ত হয়, বিশ্বনাথ সেই করতেন।

যেখানে অনেক কায়স্থ বিয়ে করে সেখানে যা নুনের কুঠিতে দারোগার চাকরি করতেন। বিশ্বনাথও তখনি একটা নতুন কুঠির দারোগা হয়ে ছিলেন। কীরাট গঞ্জের ঈদ আজ সুখের গড়গড়ায়। প্রজার শোভার নিকেতন। আমরা যে সময়ের কথা বলছি তখন এখানে ম্যালেরিয়া ছিল না। গ্রামের লোকেরা সুস্থ ছিল আর এখানে অনেক ভদ্রলোকের বাস ছিল। এখানে একঘর ভোঁসাই বাস করতেন, তাঁদের ছিল গোপীনাথ ঠাকুর। তাঁরা খুব ধর্মপরায়ণ ছিলেন। পিতৃহীন বিশ্বনাথ ভোঁসাই-কর্তার কাছ থেকে কিছু জমি পেয়ে কীরাটেই নিজের বাড়ি তৈরি করেন।

ছেলে চাকরি করে, বাড়িও নিজেই করেছে। এখন বিশ্বনাথের মা সরস্বতী দেবী ছেলের বিয়ের জন্য ব্যস্ত হলেন। পাত্রী খোঁজা হতে লাগল। কিছুকালের মধ্যে মনের মতো একটি সুন্দরী সুলক্ষণা মেয়ের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই মেয়েটিকেই ঘরের বৌ করে নিয়ে এলেন সরস্বতী দেবী। ছেলের বিয়ে দিয়ে তিনি খুব আনন্দলাভ

ছিলেন। সুকবি বেণীময়ী বর্ধমান রাজসভার পণ্ডিত সার্বভৌম চট্টোপাধ্যায়ের দৌহিত্রী রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়ে। তাঁর শাশুড়ির নাম তাঁর তালেক সুন্দরী ছিল।

বিশ্বনাথ ও বেণীময়ীর চার ছেলে ও দুই মেয়ে। ছেলেদের নাম: দুর্গাপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, গঙ্গাপ্রসাদ ও রাধিকাপ্রসাদ। গঙ্গাপ্রসাদের জন্ম ১৮০১, ৬ই মার্চ। গঙ্গাপ্রসাদ সবে শিশু তখনই বিশ্বনাথের নিজকর্মস্থানের চাকরি যায়। চারটি শিশুসন্তান নিয়ে কীভাবে সংসার করবেন, এই চিন্তায় তিনি অস্থির হলেন। শ্বশুরের কোনো সম্পত্তির দাবিদারী তাঁর ছিলনা। নিরুপায় বেণীময়ী দাসখতি চারটি ছেলে নিয়ে ওড়ুরা পাথারে পড়লেন। ঠিক এই সময়ে বড় ছেলেটির বৈতে যাবার সময় হলো। ছেলের যখন ৯বছরে, তার চেয়ে বেশি যখন বাপুলের ছেলের বৈতে দেবার নিয়ম নেই। ছেলের বৈশাখমাসে আসত ছিল কালীঘাটে বৈতে দেওয়া হবে। বৈতের প্রথা অনুযায়ী দেখা, দু'চারজন প্রতিবেশিকে সঙ্গে নিয়ে কিছুদিন মৌজা করে বসবেন। বিনাড়ম্বরে কালীঘাটে দুর্গাপ্রসাদের বৈতে হয়ে গেল। বারটী ব্রাহ্মণ প্রতিবেশি দিলেন। পাঠশালায় পাঠ শেষ করে, দুর্গাপ্রসাদ তখন পালের বলাগড় গ্রামে, শিশুবাড়ি স্কুলে পড়তেন। ছেলের বৈতে হবার দু'তিনমাস পরে বেণীময়ী দেবী শ্বশুরের অবর্তমানে সকল পুরী ত্যাগ করেন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়।

মায়ের মৃত্যুতে দুর্গাপ্রসাদ খুব কাতর হলেন। ছেলের পড়ার ও খাবারের সুবিধা হবে ভেবে করে বিশ্বনাথ তাঁকে আবার তাঁর মামাতো ভাইদের

কাছে রেখে চলেন। স্ত্রীর মৃত্যুতে শোকে অস্থির হলেও ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে বিশ্বনাথ ধৈর্য ধরে বড় ছেলেকে সান্ত্বনা দেন। সাধ্যে কিছুই কুলানো তখন তাঁর ছিলনা। তাই কলকাতার কাছাকাছি কোথাও কম খরচে দুর্গাপ্রসাদ মানুষ করবেন। সমস্যা দেখা দিল তিনটি শিশু ছেলেকে মানুষ করা নিয়ে। বাড়িতে অবৈতনিকের একটা পুরোনো ঝি ছিল—নাম ভবতারী। সে তার যতনের অসহায় ছেলেদের মানুষ করার দায়িত্বটা নিল।

দুর্গাপ্রসাদ কলকাতাতে থেকেই পড়াশুনা করতে লাগলেন। স্কুলের শিক্ষক ও সহপাঠীরা সকলেই তাঁর প্রশংসা করতো। তাঁকে ভালোবাসতো। সাহিত্যও করতেন সুযোগ পেলে। কিন্তু আদর-যত্ন কারো কাছে বেশি পেতে না। কলকাতায় পড়া শেষ হলে দুর্গাপ্রসাদ কর্মসংস্থানে চলেন। প্রতিবেশি, সোনাক গাঙুলির বাসায় থেকে লেখাপড়া করতে থাকেন। এই সময়ে (১৮-৪৯) বিশ্বনাথের মৃত্যু হয়। মৃত্যুকালে প্রতিবেশি রায় মুখুজ্যেকে তিনি বলে গিয়েছিলেন অনাথ ছেলেমেয়েদের দেখবার জন্য। দুর্গাপ্রসাদের কাছেও পনেরো বছর। তারপর মৃত্যুশয্যায় তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তিনি বলেছিলেন: বাবা, আপনি কিছু ভেবে মনে কষ্ট পাবেন না। আপনার যে দেনা আছে তা শ্বশুর থেকে আসবে হয়ে, আপনি অমনি চলে যাবেন। আর ঐটার জন্যে কোনো চিন্তা করবেন না, আমি তার ব্যবস্থা করব। এই বলে তিনি তাঁর পায়ের ধুলো মাথায় তুলে নিলেন। বিশ্বনাথ ছেলের দিকে একবার তাকিয়ে, চোখে-চোখে। হাতটি বুকের ওপর রেখে ইষ্টদেবতাকে চিন্তা করতে করতে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

বাপের শ্রাদ্ধ শেষ হবার পর দুর্গাপ্রসাদ খবর পেলেন তিনি আট টাকার
৭ নাগীরিদের মত
স্কলারশিপ পেয়েছেন। এই আট টাকা পাওয়া তখন ভাগ্যবানের চিন্ন ও গিলার [redacted]
বলে নিজে মনে করলেন। তারপর মেহশীলা মা, বৃদ্ধা জননীর হাতে কইগুলি তুলে
দিয়ে ও পরের শ্রাদ্ধবাসরে আসবেন ও কৈফিয়ৎ দিয়ে দুর্গাপ্রসাদ বেরিয়ে পড়ে
চিঠি লিখে চলেন ও তাদিয়ে পড়াশুনা করতে লাগলেন। অনেক টাকা দিয়ে দুটি টাকা নিজের
হাতে রেখে বাকী চারটি টাকা নিয়মিতভাবে পাঠিয়ে দিতেন। তারপর আরো
অনেক অসুবিধা হলেও কষ্ট করে আরো বেশী কষ্ট নিজে পড়তেন। মধ্যবিত্তের
দায়, ভাইদের দায় তখন তাঁর ওপর। ভাইদের ভবিষ্যৎ তখন তাঁর কাছে বড়ো হয়ে
উঠেছে।

স্কুল ছেড়ে আসুন একটী স্কুল- মাষ্টারী যোগাড় করবার চেষ্টা-
প্রসাদ একবার ভাই ভিটিকে সঙ্গে [redacted] নিয়ে আসুনে গেলেন। তখন থেকে তাদের
শিক্ষিত করে তোলাই তাঁর জীবনের ব্রত হলো। বিনামাইনেতে ছাত্রদের পড়াতেন,
সকালে ও সন্ধ্যায় দুর বেলা দশটা পর্যন্ত পড়াতেন। নিজে তো বেশী ভাইদের
শিক্ষার প্রয়োজন বুঝেছিলেন, ভাইরা তেমনি সাদার আকাঙ্ক্ষা হয়ে ভালোবাসা ও
সহিষ্ণুতা নিয়ে পড়াশুনা করতে থাকলেন। [redacted] ভাইরাই নিজেদের কাজ
পরস্পরকে সাহায্য করতেন। নিজের হাতে গেঁথে তরকারি পরম তৃপ্তির
সঙ্গে খেতেন। সামান্য কিছু টাকায় কিভাবে সংসার চলতো তা ভাবলে
বিস্ময়ে অভিভূত হতে হয়। বলে মাদা মোটা চিন্তিত ছিলেন, তেমনি ভাইরাও পরের
তাড়াতাড়ি উন্নতি দেখে খুব আনন্দিত হলেন। দুর্গাপ্রসাদ একটী ভালোবাসা পেলেন

পেয়েছিলেন ; যেটি তাঁর খুব আদরের জিনিস ছিল। ভাইদের বলতেন, তোরা এই রকম জেদ খেলে আমি আরো কত বেশি খুশি হব। দুর্গাপ্রসাদ খুব আত্ম-বিশ্বাসী ছিলেন। তাঁদের স্মৃতিতে তাঁর ছায়াছবি ধরে ছিল।

আদুলের খুড়ে ভাইদের লেখাপড়া যতদূর হতে পারে ও শেষ হলে দুর্গাপ্রসাদ [redacted] বেন ও ছোট ভাইকে কলকাতায় রেখে পড়াবার ব্যবস্থা করলেন। হরিপ্রসাদকে নিজ আড়ুই রাখলেন, কারণ সে আর কোথাকারই থাকতে চাইত না। পরে তিনি ওভারসিয়ারের চাকরি নিয়ে যেখানে যান, হরিপ্রসাদকে সঙ্গে নিতেন। এই দুদিক নিয়মিতভাবে যত্নপত্র দিয়ে ও কিছু সঞ্চিত রোজ দুইবার খুব সাধারণভাবে থাকলেন। পেশা বৃত্তি নিজেও কিছু অর্থসাহায্য করতেন। দুর্গাপ্রসাদ কিছুকাল চাকরি করে কিছু টাকা জমিয়ে বীরভূমে চলে এলেন।

তাঁর মৃত্যুকালে তাঁকে খুব যে বেশী দিয়েছিলেন, দুর্গাপ্রসাদ তা বলেননি। যাঁরা বিপদাপদের দুঃসময়ে টাকা ধার দিয়েছিলেন তাদের সবাইকে ডেকে সুদসহ শোধ করতে করেছেন। সবশেষে তাঁর কর্তব্যবুদ্ধির প্রশংসা করলেন ও মুখ ছেড়ে দিলেন। নিজের বিয়ের পর দুর্গাপ্রসাদ দুইজন তাঁর ছোট ভাইদের বিয়ে দিলেন। কলকাতায় নিমতলা ঘাঁটের কাছে হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বড় মেয়ে ক্ষেত্রমণির সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের বিয়ে হয়। পরে দুর্গাপ্রসাদ সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন। অনেকদিন ধরে মুখুজ্যেদের লক্ষ্মী অন্নপূর্ণার আসরে [redacted] সমারোহের সঙ্গে পূজা হতে থাকে।

গঙ্গাপ্রসাদ ডাক্তারি পড়তেন, রাধিকাপ্রসাদ ইঞ্জিনিয়ারিং। তাঁদের

দাদাই সমস্ত ভার নিলেন। বৌবাজারে আলাদা নিয়ে একটা বাড়ি ভাড়া করে
তাঁরা সেখানে থাকতেন, রোজ আসতেন। রাধিকাপ্রসাদ যথাসময়ে ইঞ্জিনিয়ারিং
কলেজ থেকে পাশ করে সরকারি কাজে নিযুক্ত হলেন। সাগরপ্রসাদের মেডিকেল কলেজের
শেষ পরীক্ষা হতে মাত্র এক বছর বাকী ছিল। এই সময়ে ১৮৬৪ সালের ১৯শে
জুন, মেয়রের ভোর আঁচটার সময় বৌবাজারের সে বাসায় সেবতী কন্যাটিকে দেবী
সরস্বতী খুব সজ্ঞান প্রসব করলেন। বংশে প্রথম মেয়ে হওয়াতে সকলেই আনন্দিত
হলেন। দুর্গাপ্রসাদের আনন্দের সীমা নেই। পিতা বিশ্বনাথ খুব শিবের ভক্ত
ছিলেন। তাই বংশের এই প্রথম সন্তানটির শিবের নামে নাম রাখা হলো
'আশুতোষ'।

বৌবাজারের অখ্যাত আলাদা মেসের এক অখ্যাত, দরিদ্র ব্রাহ্মণ
পরিবারে যখন সন্তানরূপে যিনি ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন, [redacted] কেউ কি কল্পনা
করতে পেরেছিল যে, তিনি শুধুমাত্র বংশে নয়, এই বাংলার শ্যামল মাটিতে সেদিন
প্রত্যুষের সেই শুভক্ষণে কলকাতায় যে এমন প্রবল প্রাণশক্তি সম্পন্ন মানুষ যিনি
আপন প্রতিভাবলে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেছিলেন আর এই দেশের উচ্চ শিক্ষার
ইতিহাসে এক দিগন্ত খুলে দিয়েছিলেন সেই সুজাতকে।

—

॥ দুই ॥

শৈশবে ছেলেমেয়েদের জীবন, পরিবেশের প্রভাব আর শিক্ষায়তনের প্রভাবেই গড়ে ওঠে। বিদ্যাসাগরের জীবনে তোমরা এটা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছ। আশুতোষের শৈশবজীবনেও তাঁর শিক্ষায়তনের প্রভাব ছিল। তাঁর লেখার ভঙ্গিই আলাদা বলি।

বীরাটের পাঠশালায় লেখাপড়া শেষ করে বালক গগনপ্রসাদ চলেন কলকাতায়। প্রথমে বড় জোর শহর কলকাতার যেমন না ছিল এখনকার মতো শোভা, না ছিল কোনো সজ্জা। ছিল সব রকমের অসুবিধা — এখানে ওখানে নর্দমা, রাস্তার যেখানেসেখা ময়লা-আবর্জনা আর ছোকরা ছুতোরমিস্ত্রিদের রাজত্বকাল। আর ছিল সবচেয়ে অসুবিধা। বিদ্যাসাগরকে নিয়ে বেঁচে থেকে হলে। তখন যাঁরা স্কুলকলেজ থেকে এখানে পড়তে আসতেন, এইসব অসুবিধের কথা তোমরা আসতেন। দাদার আমল এসব অসুবিধার তুলনায় বালক গগনপ্রসাদ নিরুপায় প্রমাণ এতটুকু। ঘরে বসে লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়া, সাহিত্যিকের বড়োমানুষ হওয়া খুব কমলোকের জীবনেই দেখা যায়। তোমরা জানো বালক বিদ্যাসাগর কলকাতায় এসে ঘর ছেড়ে বসে লেখাপড়া শিখেছিলেন। গগনপ্রসাদের ছাত্রজীবনটা কিন্তু সেরকম ছিল।

তখনকার কলকাতায় আর একটা অসুবিধা এই ছিল যে সমস্ত শহরে ছাপাবিদ্যা বেশি ভালো স্কুল ছিলনা। কলকাতায় এসে গগনপ্রসাদ অবশ্য চেষ্টার পর হেয়ার স্কুলে ভর্তি হলেন। সে বছর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় সেই বছরেই প্রবেশিকা পরীক্ষা পাশ করে গগনপ্রসাদ কলেজে ভর্তি হন। যেদিন

তিনি পরীক্ষার 'ফি' জমা দিতে যাবেন সেদিন বিশ্বনাথবাবু হঠাৎ দারুণ বিপদে পড়তে হয়েছিল। রাস্তায় ফি'র টাকা হারিয়ে যায়। তখন প্রবেশিকা পরীক্ষার ফি ছিল দশটাকা। বড়দাদা দুর্গাপ্রসাদ অনেক কষ্টে এই দশটাকা যোগাড় করে তাঁর হাতে পাঠিয়েছিলেন; ফি জমা দেবার শেষদিনই ছিল সেটি জানিয়ে। তাড়াতাড়ি জমা দেবার জন্য গাঙ্গীপ্রসাদ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলেন, পথে পকেট-কাটা হঠাৎ তাঁর সব টাকা নিয়ে অদৃশ্য হলো। গাঙ্গীপ্রসাদ দুঃখিত অন্তরে ফিরলেন, আত্মীয়-স্বজন অনেকের বাড়ি বাড়ি ঘুরলেন, হঠাৎ পয়সাও জুটলো না। শেষ পর্যন্ত সবদিন বিপিনবাবু সাহেব অধ্যাপকের কৃপায় গাঙ্গীপ্রসাদ এই বিপদ থেকে উদ্ধার হয়েছিলেন।

শোনা যায়, উত্তরকালে আততায়ী যখন তাঁর সবচেয় বীরত্বের এই বিপদের কথা উল্লেখ করতো, তখন তাঁর চোখ দুটি জলে ভরে উঠতো। হয়তো, বেচারা আর হতভাগ্য মুখুয্যে বাবু সেদিন এই মহাত্মা বিপিনবাবু সাহেব বাবার ফিয়ের টাকা না দিতেন। ছাত্রজীবনে গাঙ্গীপ্রসাদ অনেক দুঃখকষ্টের ভেতর দিয়ে দিন কাটিয়েছিলেন। ১ রাস্তায় লাইট-পোস্টের নীচে দাঁড়িয়ে পড়া মুখস্থ করতেন।
১ তাই [redacted] যখন তাঁর ক্ষমতা হলো তিনি দুঃস্থ ছাত্রদের সাহায্য করতেন।

বি.এ. পাশ করার দু'বছর পরে গাঙ্গীপ্রসাদ ল্যা.বি. পরীক্ষায় বিশেষ কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। ডাক্তারি পাশ করার পর তিনি দক্ষিণ কলকাতায় একটিমাত্র ডাক্তারখানায় স্বাধীনভাবে চিকিৎসা-ব্যবসায় আরম্ভ করেন। ডাক্তার গাঙ্গীপ্রসাদ মুখুয্যের ১ লোকে বলতে সাহস পেতো। খ্যাতি রাতে আকাশদিয়ে ছড়িয়ে পড়ে। প্রচুর অর্থাগম হতে থাকে। এইসময়ে তিনি বাংলা প্রথায় ভিন্নধর্মা একটি বই লেখেন। [redacted]

'ডাক্তার গাঙ্গীপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়' – এই নাম তখন লোকের মুখে মুখে। শুধু নামের নিম্নে চিকিৎসক হিসেবেই তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েনি। তিনি ছিলেন সফীয় চিকিৎসক। যেখানে যেখানে রোগীর তেমন সমাধি নেই, সেখানে তিনি 'ভিজিট' নিতেন না। আমার অনেক ছোট 'ভিজিট' নেওয়া ছেড়ে থাক, নিজে ক্রিপ্লেসমারি থাকে তিন দামে ওষুধ ও পথ্য যোগাতেন।

হতো। তাঁর এই বইগুলি তখন খুব বিক্রী হতো। বিদ্যি যখন আসেন, তখন মেডিকেল কলেজে ইংরেজি ও বাংলা দুটো বিভাগ ছিল। বাংলা বিভাগের ছাত্রদের জন্য বাংলা-ভাষায় তেমন ডাক্তারি বই ছিলনা। গাঙ্গীপ্রসাদের বই এই অভাব দূর করেছিল। এই বই-গুলি ছাড়া, ছেলেমেয়েদের জন্যও তিনি 'আত্মমাইন' নাম দিয়ে একটি সুন্দর বই লিখেছিলেন। ডাক্তারি ব্যবসায় যখন তাঁর পসার হলো তখন গাঙ্গীপ্রসাদ কলকাতাতেই হ্যারিসন রোডের উপর একটি বাড়ি তৈরি করালেন এবং মাঘ সংক্রান্তির দিনটায় মাতৃ এই নতুন বাড়িতে তিনি গৃহ প্রবেশ করেন। আপনারা বোধ হয় আজ তাঁকে দেখতে।

→ গাঙ্গীপ্রসাদ খুব উদার মনা ছিলেন।

টাকা খরচা করতেন প্রচুর, কিন্তু অপব্যয় তাঁর ছিলনা।

তাঁর রসবিচার ছিল সর্বজনগ্রাহী। হিন্দুত্বের প্রতি খুব আস্থা ছিল।

পোশাক-পরিচ্ছদের আড়ম্বর মোটেই ছিলনা। অবশ্যই স্বচ্ছ বেশ ছিল তবুও পরিষ্কার ছিলেন তিনি।

তিনি গাঙ্গীপ্রসাদের চরিত্রের এইসব দিক খুব আলোচনার মধ্যে না এনে দেখা দিয়েছিল।

space

আপনারা তাঁর পিতৃসমাজের অভ্যাগত সন্তান।

কথা বলেন, মা ব্রজসুন্দরী দেবীও তেমনি অসাধারণ গুনবতী ছিলেন। কথায় বলে, পিতৃমাতৃ ও মহতের গুণের ফলেই সুপুত্রের জন্ম হয়। গাঙ্গীপ্রসাদ ও ব্রজসুন্দরী

দেবীও অনেক কথায় আর অনেক যুক্তির মধ্যে আশুতোষকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারেননি।

জগত্তারিণী দেবী সাধারণ মেয়ে হয়ত অনেক অর্থেই 'অসাধারণী' ছিলেন। সাধ্য সিধ্যি বিচার বিবেচনা করতেন না। ছেলেবেলায় আশুতোষ তাঁর মায়ের কাছেই রামায়ণ-মহাভারতের গল্প শোনাতেন। সব সময়েই তিনি ছেলেকে বলতেন, দশজনের মধ্যে মিশতে হবে। ছেলে যদি কোনদিন ঘরে এসে জিজ্ঞাসা করতো দশজনের মধ্যে ওঠবস করা মানে কি? — তাহলে মা বলতেন, ঘর মানে লোকের ঘরে যেতে হবে, বিদ্যায় বুদ্ধিতে তাদের সঙ্গে মিশতে হবে।

মায়ের এই কথা আশুতোষের মনে এঁকে গিয়েছিল সেই বয়সেই। জগত্তারিণী দেবী সর্বদাই উপদেশ আর উপদেশপূর্ণ কথায় ছেলের মনে বড় হওয়ার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দিতে প্রয়াস পেতেন। কোনদিন নিরাশ হবার শিক্ষা তাঁর হয়নি।

আশুতোষের উদ্ভাবনী আর বিশ্লেষণী অনুসন্ধিৎসা — এই দুটো দিকই আশুতোষের মধ্যে দেখা গিয়েছিল। এই বয়সেই তিনি বিভিন্ন বিষয়ে বিদ্যা বুদ্ধিতে এই দেশের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মধ্যে একজন হয়েছিলেন।

ডাক্তার সর্বাধিকারীর কথা মনে পড়ে সুমনা, তেমনি ব্যক্তিত্ব। ছেলের মধ্যে ছিল তার পিতার এই আদর্শ। এই আদর্শই অনেক আশুতোষকে গড়ে তুলতে প্রেরণা দিয়েছিল। নানা কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকলেও সর্বাধিকারী কিন্তু

এক মুহূর্তও ছেলেকে ভুলে থাকলেন না। তাঁর সতর্ক দৃষ্টি সবসময়ের জন্য ওদের আশেপাশেই ঘোরা-ফেরা করত। ওদের জন্মের পর থেকেই তাঁর মনে দুই ধারণা বদ্ধমূল হয়েছিল যে, আশেপাশে কখনও বড়ো হবেন, দেশের ও দশের মুখ উজ্জ্বল করবেন। এই ছেলেকে নিয়ে কখনোই মনে-প্রাণে খারাপ করে, অবহেলা এতটা হলো বলে মনে করলেন না। তাঁর সকল দৃষ্টি ফিরে যাবে ওদেরকে সর্বক্ষণের জন্য। দুর্ঘটনা মুহূর্তে তিনি শিশুর প্রতিটা গতি-প্রকৃতি নজর করে ওর বিষয়ের সমাধান করবেন।

এই এলাকায়, পিতা-মাতার স্নেহমাতে আশেপাশেই সবাই ওদেরকে চিনতেন।

#space#

মেঝবৌ পিতার মেঝো মেয়ে ছিলেন তিনি।

বাড়িতে সবসময়ের কেউ ডাকতেন আশেপাশে।

এখন তাঁর বয়স পাঁচ বছর। বাড়ির কাছেই [redacted] নাম- 'শিশু-বিদ্যালয়'। নামেই বিদ্যালয়। আসলে ওটা ছিল নীলরঙা ছিটের দুয়োর দালান। স্কুল বসত সেই দালানে। একটা ঘরের বারো জনই একসঙ্গে পড়তে গেলে পরস্পর দেখে। ঐ পাকার তুলে সব। অতজন পড়ুয়ার হলে, গোলমাল হলে বসবার জায়গা। সবার আশেপাশের এ স্কুল পছন্দ হলো না। সবার পিতা স্কুল থেকে ফিরেই তিনি বললেন, বাবা, আমি স্কুলে যাবো না।

-কেন?

-ওটা কি স্কুল নাকি?

তবে কি?

"হুঁ হোলের আবে! আমি ও স্কুলে পড়ব না।

ছেলের অবাধ্য আচরণে গণ্যপ্রসাদ বিস্মিত হলেন না। পরের দিন নিজে নিয়ে গেলেন চক্রবেড়ে শিশু-বিদ্যালয়ে। সেখানে, কেলাইকুমার একটা ধমকানি দিতেই ক্লাসের বাকী ছেলেরা যেভাবে বসে একসঙ্গে পড়ছে! সত্যিই তো এই কোলাহলের মধ্যে পড়া হলে পালোয়া বিস্তুলই! পুরনো শিক্ষককে গণ্যপ্রসাদ জিজ্ঞেস করলেন, আর ঘর নেই?

"আজ্ঞে না। আমাদের এই একটিমাত্র দালান।

"দালানের সামনেই তো বারান্দা রয়েছে। আরো কিছুদিন আলাদা আলাদা ঘর তুলে নিন না।

"আর টাকা, টাকা কোথায়?

"টাকা আমি দেব।

এর পরেই গণ্যপ্রসাদের ঈশ্বরায় দালানের সামনের বারান্দায় কিছুদিন ধর উঠল। আবার মনে আর এত দুঃখ নেই। আনন্দে নিয়মিত পড়তে যেতে লাগলেন।

গণ্যপ্রসাদ মেডিকেল স্কুলের প্রায় প্রত্যেকটি পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হলেন। ফিজিওলজিতে প্রথমস্থান অধিকার করলেন। ফিজিওলজির ঐ অধ্যাপনার কৃতিত্বের জন্য পরবর্তী জীবনে তিনি পেয়েছিলেন। পুত্র আশুতোষের ঈশানের অনুসন্ধান গণ্যপ্রসাদ ছেলেকে যেই মেডেলটা দেখিয়ে বলতেন, বাবা ঘরে পড়ছি, অমনি দুই-৪ রকম প্রকাশনা

যেতেন পাবি।

প্রথমিকের শিক্ষা তাঁর মনের মতো উপাকরণের জীব রোধ করেন।

সকালে যে ছেলে ঘুম থেকে উঠতে পারেনা, জীবনে সে উন্নতি করতে পারেনা, বালক আশুতোষকে এই উপদেশ দিয়েছিলেন তাঁর পিতা। উপদেশটা ছেলের মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল। সেই বাল্যকাল থেকে খুব ভোরে ঘুম থেকে ওঠার যে অভ্যাসটা আশুতোষ আয়ত্ত করেছিলেন, সারাজীবন সেটা দিব্যি বজায় ছিল। আশুতোষ যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের পদের শিক্ষাবিভাগের [redacted] হবেন সাহেব হয়ারোডের বাড়িতে সকলে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলেন। তখন রাত সাতটা। তিনি ভেবেছিলেন যে, কিছু পরেই আশুতোষ সাহেব ঘুম থেকে উঠবেন, তাঁকে অপেক্ষা করতে হবে। কিন্তু তখন সাতটা পেরিয়ে আরো খানিক সময় চলে গেল। ঘটনা সাহেব এল করেন। তিনি দেখে খুব ভোরে আশুতোষ হাইকোর্টের নথি পড়ছেন।

– So you are an early riser, Sir Ashutosh?

– Not early riser, rather earliest riser. I get up from my bed just at 5 A.m. and this has been my habit since my childhood days. I learnt it from my father.

ছেলেবেলায় খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে, হাতমুখ ধুয়ে সারদা মঙ্গল থেকে বেরিয়ে আশুতোষ। এই নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম হয়নি কোনোদিন। কিছুদিন আগে দেখা গেল আশুতোষ এত ভোরে ওঠেন যে, তাঁর সঙ্গে ভোরে

ওঠেননা। বাড়ির সবাই ঘুম থেকে উঠবার আগেই তিনি উঠে বসে থাকতেন।
প্রভাতে বেড়াবার সময়টুকু বৃথা যেতনা।

বৃন্দাবন থেকে বাড়ি ফিরে ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে গগনপ্রসাদ ময়দানে আসতেন। তার সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে তিনি মুখে মুখে কত দিশি, বিদেশি, কত গল্প কাহিনী শিক্ষা দিতেন। উৎসাহী ছাত্র মনোযোগ দিয়ে শুনত। কত মহাপুরুষদের কথা শোনালেন ছেলেকে গগনপ্রসাদ। একদিন বললেন, মহাপুরুষদের জীবন থেকে আমরা কত কিছু শিখতে পারি; কবে কে কবি লংফেলো বলেছেন:

Lives of great men all remind us
We can make our lives sublime.

মহাত্মাজী মহাত্মাদের আশ্রম চলে পুণ্যভূমিতে বরণীয় হয়েছেন, পুণ্যতীর্থ হয়ে গেছে পুণ্য তীর্থ চলছে।

সবার মুখে সমর গল্প শুনতে শুনতে বালকের চিত্তটুকু মন আকাশে, আনন্দে আর আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো।

প্রভাতবেলায় বেড়ানো শেষ হলে বাড়িতে এসে সকলে তাঁর পাঠে মনোনিবেশ করতেন। প্রথমে পুরানো পড়াগুলি পড়তেন, তারপর নতুন পাঠগুলি, দাসী সকালের স্নান করে যেয়েদের সঙ্গে স্কুলে যেতেন। তিনিও স্কুলে যেতেন, যেদিনটি বা সময় করে সময় নষ্ট করতেন না। মধ্যাহ্নভোজনের বিশ্রামের পর গগনপ্রসাদ ছেলেকে নিয়ে বসতেন, স্কুলের পড়া জিজ্ঞাসা করতেন, নতুন পড়া বুঝিয়ে দিতেন। স্কুলের শিক্ষকরা বালকের অধিকার দেখে বিস্ময় প্রকাশ

কিরকম। তবুও তো ভাবে, এত পড়ে কি করবে! শুধু কি পড়া? কী অসম্ভব ধারণাশক্তি আর স্মরণশক্তি, যা শোনেন, সব তাঁর অন্তরে স্থায়ী হয়ে যায়।

চন্দননগরের শিউ-বিদ্যালয়ের দু'বছরের পড়া দু'বছরেই শেষ করে ফেলেন তিনি। ১৮ বছর বয়সী ছেলে বয়সে আর কেউ যায়নি। মাইনর স্কুলের পড়া শেষ হয়। গঙ্গাকৃষ্ণবাবু কিন্তু তাঁকে কোনো ইংরেজি স্কুলে ভর্তি করে দিলেন না। নিজেই ছেলের শিক্ষক হবার সংকল্প করলেন। ছেলের জন্য তাঁদের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন এবং প্রত্যেকটি বিষয় শিক্ষা নিজে দেখে নেবেন বলে ঠিক করলেন।

- শুধু বইয়ের মধ্যে দিনরাত মুখ গুঁজে থাকলে কিছুই হবে না, বলতে হবে, চরমমতো ঘরে বাইরে উচ্চাভিলাষী ছেলে আদৌ বড়ো হয়না, এই শিক্ষাই দিতেন গঙ্গাকৃষ্ণবাবু তাঁর প্রিয় ছাত্রকে। বলতেন- উচ্চশিক্ষাই মহত্ত্বলাভের সোপান। উচ্চাভিলাষী হওয়া স্থবিরীতে কে কবে বিদ্যায়, জ্ঞানে, ধর্মে, অর্থে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পেরেছে? এটা ছিল বলেই না সামান্য ঘরের ছেলে নেপোলিয়ান অত বড়ো হতে পেরেছিলেন। বিদ্যাসাগর অত বড়ো হলেন কি করে? উচ্চাভিলাষী ছিলেন বলেই তো।

ঘরের মুখে এই সব কথা শুনতে শুনতে বালক আশুতোষ ক্রমে তাঁর পিতা নবীন আশায় ভরে উঠতো। মেধাশক্তি ক্ষণজন্মাত্ত দুর্লভ ছিল তাঁর সম্বল। গঙ্গাকৃষ্ণবাবুর কাছে এত বড়ো বড়ো কথা আসতো। আসতো দ্বারকানাথ মিত্র। হাইকোর্টের জজ। তাঁকে দেখে বালক হৃদয় আশুতোষের ভরে উঠতো উচ্চাভিলাষে।

ঘোর থেকেই আশুতোষ প্রশ্ন পেলেন তিনি মইকোপ্টার কবে চালাবেন। সেই সঙ্গে আরো একটা উদ্ভাবনী মস্তিষ্কের ঘরে করলেন— P.T.S. হতে হবে। উত্তরকালে মানবের জীবনে এই দুটি যন্ত্রই চরিতার্থ হয়েছিল।

নিজের শৈশব-জীবনের কথা বলতে গিয়ে আশুতোষ বলতেন, ছেলেবেলায় বাবার কাছে শিক্ষা পেয়েছিলাম, একটু ইঙ্গিত পেলে কাজ করা— দুঃ প্রতিজ্ঞ হওয়া চাই আর সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ করা চাই। কেষ্টা, আলস্য আর ঐকান্তিক যত্ন না থাকলে কোনো কথায় উন্নতিলাভ করা যায় না।'

আশুতোষের জীবনে আমরা দেখতে পাই কেষ্টা, আলস্য, যত্ন আর দৃঢ় প্রতিজ্ঞা। ছাত্রজীবন থেকেই তাঁর চরিত্রে এইসব গুণ দেখা দিয়েছিল। চরিত্র গড়ে তুলবার প্রথমটি উপায় অনুসরণ। একথা কবলের জীবনীপ্রসঙ্গে বইতে দেখতে পাই শৈশবকাল থেকেই তিনি মস্তবড়ের মধ্যে থাকে অন্যান্য বালকের সংসর্গ থেকে দূরে রাখতেন। অনেক অভিভাবক বাড়ি থেকে দিতেন না, পাড়ার ছেলেকেও আশুতোষের কাছে আসতে দিতেন না। পিতার মতো চক্ষু প্রহরীর মতো সর্বক্ষণ ছেলের প্রত্যেকটি গতিবিধির ওপর প্রখর দৃষ্টি রাখতেন। এমন বাবা খুব কম ছেলের কপালেই দেখা যায়। সিরাজদৌলার বাবা জয়নুদ্দিনের মতো তিনি এইরকম ছিলেন।

Space

বাড়িতে পড়তে লাগলেন আশুতোষ।

ইংরেজি, অঙ্ক, বাংলা ও সংস্কৃত— এইসব বিষয় পড়লেন। বাবার কাছে

সন্তান আঁধার নিশ্চয়ের। এইবারে সারদাকে সত্যকারী অন্ধকারের মধ্যেই ঘুরতে পারে খেটে বসলেন। কিন্তু এই ব্যবস্থা অত্ত পক্ষে স্থায়ীর সম্ভাবনা। দুঃখের আসুখ হলো।

পিতার দুশ্চিন্তার শেষ নেই।

তিনি নিজে ডাক্তার, কিন্তু স্নেহান্ধের কানেরের দ্রব সাহেব ডাক্তারকে দিয়ে ছেলেকে দেখালেন। ডাক্তার নির্দেশ দিলেন – সম্পূর্ণ বিশ্রাম আর পড়াশুনা বন্ধ করতে হবে। বিলুকিম এইবারে সায়। অসুখ করেনা; একটু কাজ করলে খেলেই বুক ধড়ফড় করে ওঠে। ডাক্তারসাহেব চিন্তিত হলেন। বললেন, কলকাতার বাইরে ছেলেকে কোথাও পাঠানো উচিত হতে পারে। মধুসূদন দূরে আত্মীয় থাকলেন। আজকাল বিনে বাইবারে পাঠাতে সাহস দিলেন; মনে হোলো, যা আর চাট্টি কোনো।

বন্ধুপরিবারের সঙ্গেই উপকার হলো। অস্থায়ীপক্ষ কেবল বিলু ওরে যায়। রোজ নিয়ে যেরে ঘরে আঁটি দুই আর বিলু আসন, এই তিন আসনের পড়া। বিলু গিয়েছিলেন মুঙ্গের মহায়, ফিরলেন পৌষী মাসে। মরাই মহিমায় দেখেন, ছেলের নষ্ট স্বাস্থ্য ফিরে এসেছে, শরীরও বেশ হাষ্টপুষ্ট হয়েছে। ফিরবার সময় আলীকো [illegible] মোকামা ঘাটে [illegible] ফিরবার সময়। আজকাল বিদ্যাসাগরকে দেখতে পান। কর্মপরিচয়ের পরমা পাওয়া যাঁর ছবি দেখেছিলেন, সেই চরিত্র মধুসূদনের দেখা, তাঁকে দেখতে পেলেন। পরিচয় হলে, বালককে আলীর্বাদ করে বিদ্যাসাগর বলেন, ও তুমি গাইঁ-অন্নদের ছেলে। বেশ, বেশ। মাঝে মধ্যে যেও।

—

॥ তিন ॥

দেখতে দেখতে আজকালের মধ্যে দুদিন কেটে গেল।

এইবার ছেলেকে ইংরেজি স্কুলে দিতে হবে, স্থির করলেন গঙ্গাপ্রসন্ন।

সমস্যা মুরলীধর স্কুলের কোথায় ঘর নয়। তুলনায় বেশীদূরেই। নিত্যপ্রসন্ন বাচস্পতি পণ্ডিত সিকদার পাড়ায় এই স্কুলের প্রধান শিক্ষক। কাউকে বলতেই স্কুল। ছেলেকে গঙ্গাপ্রসন্ন সেই স্কুলে ভর্তি করে দিলেন। ভর্তি হতে গেলে পরীক্ষা দিতে হয়। আর দাঁড়ান নম্বর ছাড়ের সঙ্গে আনুষঙ্গিক পরীক্ষা দিলেন। স্কুলের দ্বিতীয় শিক্ষক আজকালই বিকেলে পরীক্ষা নিলেন। খুব কড়া মাস্টার তিনি। গঙ্গাপ্রসন্ন নিজে ছেলেটিকে ভর্তি করান।

— আপনার ছেলে যে থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত, বললেন দ্বিতীয় শিক্ষক।

তবে ছেলে আসার পরিচয়ক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন — ফলে সব জন্য যা অন্য ছেলেদের মধ্যে কেউ উত্তর দিতে পারলনা। তবে তিনি এই সব কথা বললেন — থার্ড ক্লাসের উপযুক্ত। ছেলের মা-বাবা মাথা চুলকাচ্ছে। গঙ্গাপ্রসন্ন তাকে সেকেন্ড ক্লাসেই ভর্তি করে দিতে বললেন।

শুরু হয় আজকালের ছাত্রজীবন।

মেয়াদের ছাত্রজীবন নয় — দেদীপ্যমান ছাত্রজীবন।

বিদ্যাসাগরের পর বুঝি এমন তীক্ষ্ণ মেধাবী ছাত্র এদেশে আর দেখা যায়নি। গঙ্গাপ্রসন্নের মন বলছে, তাঁর এই ছেলে বিশ্ববিদ্যালয় অসাধারণ হবে। অসাধারণ যে হবে, তার অনেক প্রমাণই বালক আজকাল দেয়

বয়সের স্বার্থেই দিয়েছিলেন। স্কুলে ভর্তি হওয়ার পর, ছেলেকে পড়াশুনায় আরো উৎসাহ দেওয়ার জন্য তিনি একটি অভিনব উপায় আবিষ্কার করলেন। একদিন ছেলেকে ডেকে তিনি বললেন, দ্যাখো, তুমি যতদিন ক্লাসে প্রথম থাকতে পারবে, ততদিন করে তোমাকে এক টাকা করে দেব।

- বোজ এক টাকা, বাবা?

- হ্যাঁ। আর যদি দ্বিতীয় স্থানে থাক তাহলে কিন্তু আট আনা করে পাবে।

অশোচন্দ্রের এই কৌশলটি ব্যর্থ হয়নি। যে চার বছর আশুতোষ সরকার যুবরাজ স্কুলে পড়েছিলেন, সেই সময় তিনি প্রত্যেকটি বিষয় মন দিয়ে পড়িয়েছিলেন যে ক্লাসে তিনি বরাবর 'ফার্স্ট বয়' হওয়ার জোর লড় করেছিলেন। মাত্র দু'তিনদিন আট আনা পুরস্কার পেয়েছিলেন, তাছাড়া নিজের বাবার কাছ থেকে একটাকা করে পেলেন। প্রবেশে যতটাকা পেয়েছিলেন, তা বাড়িয়ে স্কুল-জীবনেই আশুতোষ অনেক বই কিনেছিলেন। তাঁর নিজস্ব লাইব্রেরির গোড়াপত্তন এইভাবে হয়েছিল।

স্কুলে ভর্তি হলেও বাড়িতে ছেলের জন্য উপযুক্ত গৃহশিক্ষক নিযুক্ত করলেন অশোচন্দ্র। ছেলেবেলা থেকেই আশুতোষ অঙ্কপ্রিয় ছিলেন। অন্য সব বিষয়ের চেয়ে গণিতের প্রতি তাঁর ছিল বিশেষ অনুরাগ। 'খুব ছেলেবেলায় বারান্দায় পড়তে বসার খুব ভালো লাগত', আশুতোষ বলতেন। স্কুলের প্রবেশের এই দক্ষতার পরিচয় দিবার অবকাশ ছিল না। তাই স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় সঙ্গে

আন্তর্জাতিক মানের মাঝারি ফুটবলার হতে পারেন। ছেলেরা গাঁটের পয়সা খরচ করে তাঁর কোচিং নেয় নি। তাঁর কাছে শেখা যেমন, চতুর্থ শ্রেণীতে পড়তে পড়তেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতির কঠিন অংক কষা আয়ত্ত করেন। এ কথা মেসির পরিবার বলে।

আরো কিছুদিন 'ডিউটি' করা হলো। লক্ষ্য ডিসেম্বরি ফুটবলে নাম করা পর্তুগিজ পথপ্রদর্শক ভাস্কো দা গামার জাহাজে সংস্কৃত পড়াবার জন্য। তাঁর কাছে তিনি নিয়মিত অনেক কিছু সংস্কৃত শিক্ষা করেছিলেন। এ ছাড়া সংস্কৃতি সাহিত্য, কলা, বাইবেল, আমাদের গল্পই তিনি প্রথম প্রথম পড়ে শোনান। যেমন জেনে পড়ানো, যীশুখ্রিষ্ট আরও অনেকে। অক্টোবরে ডাইরেক্টর বন্দ্যোপাধ্যায় আর অর্ধেন্দুসুন্দর দাস — এই দুজনও সংস্কৃতের শুভ শিক্ষাগুরু ছিলেন। এইসব অনেক কিছু শিক্ষকদের কাছে পড়ার একটা সুযোগ এই হয়েছে যে, তাঁদের নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক বা পাঠ্য-বিষয়ের বাইরে অনেক কিছুই তাঁরা শিখিয়েছেন। ইতিহাস, সংস্কৃত, ইংরেজি, অঙ্ক প্রত্যেকটি বিষয়ে আলাদাই তাঁর সহপাঠীদের অনেক কিছু বেশি জানতে পারিয়ে তোলেন।

(এমন লেখাপড়া) অনুকরণ করা একটা শেখা যায়।।

এই অনুকরণ আন্তরিকতার মধ্যে দিয়েছিল বেশি করে। আমাদের সকল ছাত্রদের একটা উপদেশ দিয়েছিলেন: যেমন তেমন করে পড়লে হবে না, ভালো করে শেখা চাই, জানা চাই। কিন্তু এই উপদেশ শুধুর ছাত্রজীবনে নিয়ম হয়নি। দিন দিন আরো তাঁর অনুকরণ বৃদ্ধি পায়। দিনেরাতে পড়ে পনেরো ঘণ্টা করে।

লেখাপড়ায় ওর আগ্রহের কাছে ছেলেবেলার মনে হয়ে উঠলো। আরিফ নির্দিষ্ট সময়ে হুইলিঞ্চকান পড়াতে আসেন। উঁনি আসবার আগেই আফজালী হাই, অন্যান্য সব প্রস্তুতি নিয়ে প্রস্তুত হয়ে থাকতেন। মাষ্টার সাহেব যেমনভাবেই তিনি সাধ্যমতো পড়া আরম্ভ করতেন।

কিভাবে তিনি পড়াতেন জানো? আফজালীর আগে একটা ছোট খাতায় প্রতিটি প্রশ্ন ও প্রতিটি উত্তরই মুখস্থ থাকত। তিনি খুব জোর গলায় উঁনি প্রশ্নটি বলতেন যেমন পড়ায় আগে একবার ঠিক করে নিতেন। তারপর শুরু করতেন পড়ুয়া পাঠ। যখন যা শিখতেন প্রাণপণে শিখতেন। কিছুতেই যতক্ষণ পর্যন্ত ঠিকভাবে বুঝতে না পারতেন, ততক্ষণ তিনি কিছুতেই নিজে হতে না। পাঠ্য বিষয় প্রয়োজনে শিক্ষা আর প্রতিকথা জেনে যাওয়া দরকার।

এই ছাত্র জীবনে যখন, উচ্চবংশের যারা তিনি হাইস্কুলের শিক্ষকদের প্রতি বিদ্যালয়ের উপাধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তখন তাঁরা কোনো, আফজালী তা আদৌ করেন না। আফজালীরা যখন করেন, আরও কাজে কিছু প্রমাণ করতে। 'ভালোবেসে শেখা চাই' কথা নয়, 'ভালো করে শেখা চাই' - এই ছিল আফজালীর জীবনের অন্যতম। বড়ো তিনি হতে পেরে ছিলেন এই কারণেই।

স্কুলে ভর্তি হওয়ার ছ'মাস পরের একটি ঘটনা।

মহাপ্রাণের খাবারের নিমন্ত্রণের মস্ত বড় এক বইয়ের দোকান। এই দোকান থেকেই মাষ্টারসাহেব তুলের বই কিনতেন। প্রথমদিন আফজালী উঁর

প্রথম প্রাসঙ্গিক / সঙ্গে একজন প্রথমবার ডিকশনারি কিনতে। দুকানের একটি কোনে দাঁড়িয়ে তিনি বই দেখছিলেন একমনে। এমন সময়ে কে যেন তাঁর হাত ধরে অকস্মাৎ টেনে নিল।

— আসুন তো।

চমকে পেছন ফিরে তাকালেন আশ্চর্যই। দেখেন তাঁর সামনে দুটি-সদর দরিদ্রই, একজনার ঠিক পাশে দাঁড়িয়ে আছেন বিদ্যাসাগর। তাঁর হাত ধরে টানা করলেন তিনি।

— আরে, আরে। একাকে কিজন্য টানছ?

— ডিকশনারি কিনবে।

— কেন। কোন স্কুলে পড় এখন?

— আজে সাউথ সুবার্বন স্কুলে।

— কোন ক্লাশে পড়?

— ফোর্থ ক্লাশে।

— বেশ। খুব ভাল দিয়ে পড়বে। অধ্যয়ন হলো একবারেরা তপস্যা। একো আমার সঙ্গে, তোমাকে একখানা বই উপহার দিই।

এই বলে একখানা রবিনসন ক্রুসো কিনে, বইটার প্রথম পাতায় তাঁর নাম সই করে আশ্চর্যের হাতে দিলেন বিদ্যাসাগর। বিদ্যাসাগর — বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান — তিনি নিজের হাতে তাঁকে উপহার বই তুলে দিলেন। গর্বে আর আনন্দে আশ্চর্যের বুক ভরে উঠে। বাড়িতে ফিরে বাবাকে দেখালেন সেই বই আর বললেন সব কথা।

রাধাকৃষ্ণণ নিম্ন স্বরে বললেন, আমাদের দেশে অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণ জানুয়ারি ও পঞ্চমেই আসছে। তোমাকে ওঁর মনে হতে হবে- তুমি বিদ্বান, হৃদয়বান, আর কবিও বটে।'

অগাস্টেনো আন্তলেভীর হৃদয়ে জেঁকে বসলো। বিদ্যাসাগরের নিজের হাতে দেওয়া এই উপহারটি আন্তলেভী আমৃত্যু যত্নের সঙ্গে রক্ষা করেছিলেন। ছাত্রজীবনে তিনি অনেক প্রাইজ পেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর কাছে বিদ্যাসাগরের দেওয়া রবিবাসরীয় স্কুলের' বইটিই ছিল সবচেয়ে মূল্যবান, একথা তিনি বলতেন।
space

থার্ড ক্লাসে প্রমোশন পেয়ে আন্তলেভীর পড়াশোনার কৌতুক আরো বেড়ে গেল। স্কুলের পাঠ্যপুস্তক ছাড়া তাঁর কাছে গল্পের বই পড়ে তাঁর মন ভরত না। বাড়িতে নানা বিষয়ের নানা বই ছিল। সেইসব বই তিনি পড়তে লাগলেন। রামায়ণ, মহাভারত, বিদ্যাসাগর ও অক্ষয়কুমার দত্তের বই, এমন কি বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকা পড়ে তিনি খুব আনন্দ পেতেন। নাটক নভেল বড়ো একটা তিনি পড়তেন না। কবিতার মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী, বিশেষ করে মেঘনাদবধ কাব্য, তাঁর খুব প্রিয় ছিল। মন যাতে উন্নত হয়, চরিত্র যাতে গড়ে ওঠে, এমন বইই পড়বে, অন্য কিছু ছোঁবে না - পুত্রের প্রতি এই ছিল পিতার উপদেশ।

থার্ড ক্লাসে পড়তে পড়তেই মিনটনের প্যারাডাইস লস্ট, শেক্সপিয়র, পড়ে শেষ করলেন আন্তলেভী। শুধু পড়া নয়, সবটা মুখস্থ বলতে পারতেন।

২ বই তখন সপ্তম শ্রেণির পাঠ্য ছিল। ইউক্লিডের বেশ কয়েকটি থিওরেম পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে। অঙ্ক কিষেই? আলজ্যাবের অরিথমেটিক ইতিহাস বাংলায় অনুবাদ করেছেন আর ক্ষেত্রফল, বেরিসেন্টার, ম্যাস্যুরেবল্-এই বইগুলিও অনুবাদ করেছেন ইংরেজিতে। এমন কি মেকেনের দুটি ট্রিকস্ও এইভাবে তাঁর করেস্থ হয়ে গিয়েছিল।

থার্ড ক্লাস থেকে সেকেন্ড ক্লাস।

সেকেন্ড ক্লাস থেকে ফার্স্ট ক্লাস।

প্রত্যেকবারই কঠিনতর পরীক্ষায় তিনি অবলীলায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। গণিতে যখন অনুরাগ ছিল তাঁর যে, আজকেরই যখন দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র তখন সপ্তম, পরীক্ষার গণিতের [illegible] কটি পাতা হতত্ব বেশী করে খেয়েছেন আজকেরই। নবমশ্রেণীর ২ কোটি ইংরেজীবোধই পড়ানো হয়নি। ত্রিকোণমিতির ব্যাবহারিকী সুবিধাগুলি এই বয়সে তাঁর করেস্থ হয়ে গিয়েছিল। একদম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থী ছাড়ের পক্ষে যেসব বই পড়া দরকার, তাঁদের অনেক আগেই তার কয়েক ডজন বেশি বই পাড় খেয়েছিলেন।

বইপড়াতে যখন অনুরাগ ছিল তাঁর।

অবসরকে তিনি বই পড়তে [illegible] তাঁর জীবনের করে তুলেছিলেন।

একটা বিশেষজ্ঞী সুচী নিয়ে আজকেরই নিজস্ব লাইব্রেরি করার কথা। কথা যখন তাঁর কৃষ্ণিত হলেনা। তাঁর পড়ার ঘরটি সবই ছাড়া থাক

বইয়ের মুদ্রণ হয়ে উঠেছে। মুদ্রণের পাশ্চাত্য ছাড়া, যত রো কলা ও চিত্রশিল্প এই ভাষায় সংরক্ষিত হয়েছিল তার সীমাসংখ্যা ছিলনা। ছাত্রজীবন যেমন, বড়ো হয়েও তেমনি চিরকাল নানা বিষয়ের অধ্যেতা গ্রন্থকীটের মতো কথা ধরে আজন্মকাল মানবের জ্ঞানে আগ্রহ আর উৎসাহ নিয়ে চিরযুবা জীবন ধরে রাখছেন। তিনি বললেন, জ্ঞানের আরম্ভ আছে, শেষ নেই।

রেনেসাঁসের শিল্পগুরু ছিলেন দা ভিঞ্চি একজন দার্শনিক। তাঁর এই জ্ঞানস্পৃহা দেখে নিউটনের কথা মনে হয়। অতবড়ো বিজ্ঞানী বলতেন, আমি; আমার যতটুকু শিখেছি? সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে যা দুই-একখানি প্রস্তরখণ্ড কুড়িয়ে সংগ্রহ করেছি। পৃথিবীতে যাঁরাই জ্ঞানের সাধনা করেছেন তাঁরা সকলেই এই সত্য কথা বলেছেন। আমাদের আজন্মশিশু এই সত্যবাণীর বীজ মনের মধ্যে [redacted] হতে পারেন নি।

এই রকম অদম্য জ্ঞানস্পৃহার জন্যই তো আজকের [redacted] মুদ্রণের দেরা ছাত্র হতে পেরেছিলেন। তাঁকে নিয়ে শিক্ষকদের যত গর্ব। বাসন্তীকাকাদের [redacted] কত যত্নে, কত আদরে করে নিজে ছেলেকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন। মুদ্রণের জীবনে বয়সের জোয়ার, লেখার জোয়ার, জ্ঞানের জোয়ার। মাত্রমন্দিরে আজন্মশিশু [redacted] পরীক্ষা দিলেন। পরীক্ষায় তিনি দ্বিতীয় স্থান অধিকার করেন।

—

॥ চার ॥

প্রেসিডেন্সি কলেজ

বাংলাদেশের খ্যাতনামা মনীষিদের অনেকেই এই কলেজে পড়েছেন। গরীবপরিবারের ছেলে রাষ্ট্রপতি ডক্টর রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্র ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর ও সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র এই কলেজের ছাত্র ছিলেন। ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ছাড়া নয়-কলা অধ্যাপক তাঁরা সবাই প্রায় এদেশীয় ছিলেন। বেথুন ছাত্রদের প্রথমে ইংরাজিশিক্ষা দেবার এই কলেজে পড়ে। মাইকেলমধুসূদন তাঁর ছেলেকে এইভাবেই তৈরি করে দিতেন।

ইনস্পেক্টর পরীক্ষায় আশুতোষ প্রথমস্থান অধিকার করেছিলেন বটে, কিন্তু একজন প্রতিযোগী, ছাত্র হিসাবে তাঁর নামটা ঠিক ফুটিয়ে পড়েছিল। অথচ তাঁর ত্রুটি ছিলনা। নিজে যখন স্কুলের উপরের শ্রেণীর ছাত্র তখনই আশুতোষ বিদ্যাসাগরের নতুন মুখ্যপ্রতিযোগিতা [illegible] অধ্যাপকমণ্ডলের, অন্যতম হয়েছেন। ঐ সময়ে এই বয়সে ছাত্রের এত দুঃসাহস ছিল না। এই ঘটনাটির পরে নিজে প্রাধান্যের অবাধারী মনোবৃত্তি সকলকেই চিনিয়ে দিয়েছিল। এই-গুলির মৌলিকতা দেখে অধ্যাপকের গার্দানাবিকরণ রীতিমত বিস্মিত হয়েছিলেন। তাঁর বই হলো কাব্যকাহিনী আর 'মুখার্জি ম্যাগাজিন'—এই নাম পরিচিত।

১৮৮০

আশুতোষ প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম শ্রেণীতে ভর্তি হলেন। কিন্তু হলো তাঁর ছাত্রজীবনের উজ্জ্বলতম অধ্যায়। তখন এই কলেজের

অধ্যাপক ছিলেন টমি সাহেব। মি. স্মিথ. টমি। ইংরেজি পড়াতেন রো সাহেব— এফ. বি. রো। এছাড়া ননিগোপাল উইলিয়ার্স বুথ ছিলেন আরেক অধ্যাপক। আমাকে পড়াতেন হুইলার সাহেব। এই সময়ই সিলেক্ট গ্রুপের আর একজন নতুন অধ্যাপক এলেন এই কলেজে। তিনি প্যাট্রিসিয়া সাহেব। আগেকার দিনের তাঁর প্রথম দলের ছাত্র। বেরসিক অধ্যাপকদের মধ্যে ছিলেন ম্যাকব্যথ্য প্যারী-চরণ সরকার, এডুকেশনাল সার্ভিসের মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতা।

বিলেতে যেমন অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজ, আমাদের দেশে তেমনি কলেজগুলির প্রেসিডেন্সি কলেজের নাম। যেমন সব নামকরা শিক্ষক, তেমনি সব হীরের টুকরো ছাত্র — মেধায় ও মনীষায় যাঁদের জুড়ি মেলাভার। এই বিদ্যায়তনের মুখ উজ্জ্বল করেছেন, দেশের গৌরব বর্ধন করেছেন। যেই কলেজে ঈশ্বর ছাত্র হয়ে এলেন আমাদের আগেকার। প্রেসিডেন্সি ছাত্র ছড়া অন্যের ধীর সভায়ও এই কলেজে পড়তেন। তাঁদের বেশ-ভূষা, আচার-ব্যবহার ছিল আলাদা ধরনের। বিলাসিতার পরিচয় থাকত তাদের পোশাক-পরিচ্ছদে, আর আভিজাত্যের পরিচয় পেতাম তাঁদের [redacted] কিন্তু [redacted] আকৃষ্ট হয়েছিলেন, পক্ষপাতশূন্য অন্তরে। এই সওদাগরদের ঐশ্বর্য বেশভূষা ও ব্যবহার তাঁর কাছে কোনো লাগেনা।

আরেক প্রকার অদ্ভুত প্রকৃতির লোক দেখতে পেলেন তিনি। সাউথ সুবার্বনের ছাত্র তিনি; যেমন - হিন্দু স্কুলের ছাত্ররা তাঁর

মনেহঁ যত্ন প্রকাশ দিলাতে চাইতাম। আন্তরিকতা থেকে আরো সাথে যত্নবান করেন না। তিনি লোনাম, কলকাতার ছাপনা আবহেই ঢাকা নতুন পরিচ্ছদে সজ্জিত হয়ে ফেলে আসেন। ঘরের কোচানো কাপড় ও চাদর প্রদের অনৈসর্গিক ঠাঁই করত। ইলেকট্রিক বাতি-ঝলমলে ঝকঝকে নানা রঙের বিচিত্র ফুলের লোগো তেল কলকের মোমবাতি। এই সব ঘুমন্তের নিত্য সহযোগ অনাবশ্যক পিতামহদের প্রতিকীর্তি বলা। পাশ-পুরনো প্রদের যতটা না অভিযোগ করতেন বেশি তাঁরা ছিলেন নিষ্ঠুর আধুনিক প্রকাশের কুপাত্র।

আন্তরিকতা বড়লোকের গুণ, কিন্তু তিনি খুব সংকীর্ণ পরিচ্ছদেই ফেলে আসলেন — ধুতি ও কাপড়, নাগরা ধুতি ও পলাশ সরলা কোট। তাঁর সরল অনাড়ম্বর পরিচ্ছদ, শান্ত বিনম্র প্রকৃতি আর ঔজ্জ্বল্য প্রতিভা প্রবল শিক্ষীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেনা। তিনি খুব মুখ সাজেন। তাঁর অনুরোধেও এই জন-কেন্দ্রীকে রেখে খুব কম আলোকচিত্র তুলে গেলেন। আলোকচিত্রের অনুরাগ অনিত আর খুব আগ্রহ ছিলেন এই শাস্ত্রে কৃতবিদ্য ব্যক্তি পণ্ডিত। কিন্তু 3 শিল্পীর মতে কই আজ ঐতিহাসিক প্রবন্ধ লিখিত হয়েছে। কলকাতার মতো আলোকচিত্র করার ও তারাকুমার ঘরোয়া তিনি প্রচুর আকৃষ্ট হয়েছিলেন.তা, খুব সাহেব তাঁকে আলোকচিত্র simple man বলে। তাদের পক্ষে এই কথা স্বাভাবিক বলা ছিলনা।

॥ ৫৩ ॥

অমরীশের আজ অনেক বেশি তাড়াতাড়ি পড়া।

আমরা আমাদের কথা বলছি তবে একটা কথা বলে রাখি—আমি কিন্তু ছিলাম না। তাঁরা আমাদের গল্প ছিলে, তাদের কথা আমার তাড়াতাড়ি আওয়া-আসা করেন। এঁদের মধ্যে দুজনকে আমার খুব ভালো লাগত। তাঁদের একজন ছিলেন ঝিনুক, আর একজন ছিলেন নিবেদিতা। এই দুজনই আমাদের অনেকদিন আগে ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে ঝিনুক কখনো আমাদের ছেড়ে যেতে চায়নি, কিন্তু তার কোনো উপায় ছিল না। তাকে যেতে হয়েছিল। কেন যেতে হয়েছিল?

প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ওষুধ খাওয়ার বিষয়ে লাইব্রেরি।

এই লাইব্রেরিকে নিয়ে এই গল্পটা আসলেই শুরু হয়েছিল। অনেকের বিশ্বাস প্রথমবার যেসব আজগুবি ঘটনার কথা বলেছি সেগুলো সত্যি নয়। তবে তিনটে ঘটনা সত্যি। আমরা আসলে খুব অল্পতেই খুশি হই। এই যেমন বিমান আর নৌবাহিনী একই বছরে খুশি করতে পারে। এ বিশাল পৃথিবীতে। কিন্তু একজনের জীবনে তেমনি কতো ঘটনা ঘটে? আমাদের জীবনে কি সীমা নেই? জানবার? আমরা কি কখনো জানতে পারি? আমরা যেসব ঘটনা জানতে পারি? আমরা কি কখনো জানতে পারি? আমরা কি কখনো জানতে পারি? আমরা কি কখনো

হয়ে ওঠে তাঁর জন্য। লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে নিভৃতে বসে পড়তেন তিনি। যখনই সময় পেতেন বুয়া কাজে বা অন্য আত্মীয়ের বাড়ি বেড়াতে যেতেন তখনই তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করতেন। উত্তরকালে আত্মজীবনী লিখতে গিয়ে তিনি বলেছেন: 'প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়াই আমার জীবনের উন্নতির মূল।'

[illegible]

প্রাণিবিদ্যা ও প্রাণিবিদ্যার ঐতিহাসিক ধারা বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল তাঁকে, এই কারণে অধ্যয়নকালে তাঁর অধিকাংশ সময় তিনি ব্যয় করতেন লাইব্রেরিতে। বিশেষ করে প্রেসিডেন্সি কলেজের লাইব্রেরিতে এই বিষয়ের বেশ কয়েকটি পত্রিকা আসত; সেসব পত্রিকা পড়তে তাঁকে বৈজ্ঞানিক আগ্রহ আর প্রেরণা যুগিয়েছে প্রচুর। বেছে বেছে তিনি কিছু নিয়ে পড়তেন। পড়তে পড়তে তাঁর মনে কোন জটিল সমস্যা আসলে: [illegible] তিনিও কি এই ধরনের প্রবন্ধ লিখতে ও প্রকাশ করতে পারেন না?

তাঁর এই সংকল্প ফলিত হয়।

তিনি যখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীর ছাত্র তখনই তিনি একটি প্রবন্ধ লিখে ইংরেজির প্রফেসর অব গ্র্যাসহপার্সিয়ন নামক পত্রিকায় পাঠিয়ে দিলেন। বিলেতের এটাই ছিল প্রাণিবিদ্যার সর্বশ্রেষ্ঠ পত্রিকা। আশ্চর্যজনক ব্যাপার হলো মাত্র তিন বছর। ইউক্লিডের জ্যামিতির শেষটি প্রতিজ্ঞার (Theorem) নতুন একটি সমাধান ছিল এই প্রবন্ধের বিষয়বস্তু। সত্যিই এই পত্রিকায় প্রকাশিত হলো। তাঁর অধ্যাপক বুয়া সাহেব যখন দেখলেন তখন তিনিই সবার আগে অভিনন্দিত করলেন তাঁর প্রিয় ছাত্রকে।

আরো আশ্চর্যের বিষয় এই যে, প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে পড়বার সময়েই আশুতোষ প্রথম ১ ক্লাসের জন্য নির্দিষ্ট অঙ্কপুস্তক আদ্যোপান্ত পড়ে শেষ করেছিলেন। এই সময় একদিন অধ্যাপক রসময় তাঁকে বললেন, যদি সত্যি সত্যিই তুমি গণিতে পারদর্শী হতে চাও তবে তোমার ফরাসী ভাষা শিখা দরকার।

"কেন, স্যর?

- তাহলে ল্যাপ্লাসের বই পড়তে পারবে।

- ল্যাপ্লাস! কিনি সে?

- ফ্রান্সের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গাণিতিক ব্যক্তি। তিনিই তো গণিতশাস্ত্রে নতুনত্ব এনেছে। তাঁর বই পড়তে হলে তোমাকে ফরাসী শিখতেই হবে।

দুএক সপ্তাহের তাঁকে এই কথা বললেন।

গণিতশাস্ত্রের বিরাট প্রতিভা ল্যাপ্লাস — আশুতোষ যখন একথা জানতে পারলেন, তখন থেকে ফরাসীভাষা শিখতে আরম্ভ করলেন। সেইসময় ল্যাটিন ভাষা। আদালতের ভাষা ফরাসী, চুক্তিপত্রের ভাষাও ফরাসী ভাষা। অতএব নিজের চেষ্টায় অভিধানের সাহায্যে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি এই ভাষায় ভালো দখল আয়ত্ত করলেন। 'চেষ্টার অসাধ্য কিছু নেই' — এই কথা ছাত্রের আশুতোষ। তিনি নিজেই ছিলেন এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ ভাষায় প্রবেশ করে তিনি ল্যাপ্লাস ও ফরাসী ভাষা শিখেছিলেন, একথা তাঁর শিক্ষকরাও স্বীকার করেছেন যে ফরাসীভাষায় পণ্ডিত ব্যক্তি হিসাবে বিখ্যাত হয়েছিলেন।

#1space #

বলেছি, গণিত ছিল আজীবনের প্রিয় বিষয়। কিন্তু বই পড়া বিষয়ে আগ্রহ বিষয়ে উৎসাহী করেননা। ইংরেজি সাহিত্য, সংস্কৃতি, বিজ্ঞান, দর্শন – সব বিষয়েই তাঁর সমান আগ্রহ ছিল, তেমনি ছিল দখল। ইতিহাস পড়তে বাবা খুব ভালো বাসতেন। ছাত্রজীবনে ইতিহাস পাঠের উপকারিতা কি, সেটা নিয়ে বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। তুলোচিত ইতিহাস জ্ঞান ছাড়া রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক উন্নতি সংসাধিত হতে পারেনা। এই থেকে পরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হওয়ার পর তিনি স্নাতকোত্তর বিভাগে ইতিহাস বিভাগ পৃথিবীর ইতিহাসের পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ কথা আমরা পরে আলোচনা করব।

আজকালকার ছেলেমেয়েদের ইতিহাস ভালোবাসেনা।

যেকারণে তাঁর সব সহপাঠী যেখানে পেলেন ছিপিদের সময় সাইকেলে করে আসতেন বনবিষ্ণুপুরে চমার পড়তেন। চমার ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তাঁর বই কেনা চমার পড়ার জন্য ছিল।

– স্যার, তুমি কি করছ – এখানি চমার পড়ার সময় নয়।

ক্লাসে পড়ানো হয়। আমরা কোন মতে পাশ করে যাবার জন্য পড়ি।

– এখন পড়লে পোষাবে? সারাদিন কোন ইংরেজি চমার পড়বে। আর না হয় চমারটা সঙ্গে করে নিয়ে যাবে, ফেরত আসার সময়।

আর একদিনের কথা বলি।

সেদিন ক্লাসে ইতিহাসের পরীক্ষা নেওয়া হবে। অধ্যাপক

রবসন ছাপের তিনটি প্রশ্ন দিয়ে ক্লাস থেকে চলে গেলেন। প্রাচীন গ্রীসের ইতিহাস সম্পর্কীয় প্রশ্ন। ১৫ জনী বন্ধু অর্ধশতক চলে গেলেন একদম ভিন্ন আর সব ছাত্র কখন ক্লাস নিতে ব্যস্ত থাকে। ঐই একজন আর কেউ নয়- আমাদের আশুতোষ।

- তুমি কি বই দেখে লিখছ? জিজ্ঞেস করেন শর্মাদা।

- না, স্যর! আমার কাছে বই কোথায়?

- না! কিন্তু তোমার উত্তর আর কতক্ষণ লাগা যে পরপর তিনে তোমে?

- আমি কিন্তু স্যর বই দেখে লিখিনি, সত্যি বলছি।

- তবে এই প্রশ্ন তিনটিই যে ধরে হলে তা কি তুমি বলতে?

- না, তা কেমন করে বলব?

- অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বলিহারি আর তোমার উত্তর প্রত্যাশাকে ছিন্ন হয় কি করে?

- স্যর, আমি যা পড়ি তাই আমার মনে থাকে।

- I see! What a fine memory you have, my boy. You learn by heart whatever you read. It is really wonderful.

সত্যিই, প্রসন্ন অসাধারণ স্মৃতিশক্তির অধিকারী।

#space#

প্রফেসর নিয়ম করে দিয়েছিলেন, রাত দশটার পর পড়াশুনা করা চলবেনা। 'যা পড়তে হয়, এই সময়ের মধ্যে পড়ে নিও।'

কিন্তু আজ তাঁর কিছুতেই মনযোগ যে নিজের নির্দেশ মেনে চলা অন্যান্যদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা কিছুতেই। এইভাবে নিজের অজান্তেই গভীর রাত পর্যন্ত জাগতে তাঁর অভ্যাস। প্রতিদিন রাত দশটার ঘন্টা শুনতে পেতেন প্রফেসর। ছেলের পড়ার ঘরের পাশ দিয়ে তাঁকে যেতে হবে। বাবার পায়ের ধ্বনি শুনে সে তিনি শুনতে, অমনি অপ্রয়োজনীয় আলোটা নিবিয়ে চুপ করে শুয়ে থাকতেন।

ঘরের মধ্যে যদি আলো জ্বলছে না, ছেলে নিশ্চয়ই শুয়ে পড়েছে, এই ভেবে প্রফেসর নিশ্চিন্ত মনে তাঁর শোবার ঘরে চলে যেতেন। একদিকে অপ্রয়োজনীয় খরচের কি, অন্যদিকে ছেলে জেগে থাকার আলো নেভে পড়া বন্ধ করতেন। রাত বারোটা বেজে যেত, তার আগে তিনি শুতে যেতেন না। ক্রমে আরো বেড়ে গেল—দেড়টা-দুটো পর্যন্ত পড়ে। তখন সমস্ত বাড়ি নিস্তব্ধ, ঘর নিস্তব্ধ। প্রফেসর একদিন স্থির করে নিলেন যে, বাড়ির কেউ জানতে পারবেনা।

কিন্তু একদিন জানাজানি হয়ে গেল।

সেদিন অনেক রাতে হঠাৎ প্রফেসরদের ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে থেকে ছেলের পড়ার ঘরে তিনি আলো দেখতে পেলেন। এত রাতে ঘরে আলো জ্বলে কেন? চিন্তিত হন প্রফেসর। নিঃশব্দে প্রবেশ করে

তিনি ডাকেন, আত! দেখে কথা খুলে গিয়েছে। তেবের কথা খুব কম-করেছেন। দেখে নিজে অবাক। আর্তনাদ তখনো পড়ছিলেন; তাঁর সামনে টেবিলে বই রাখা ঘড়ি দেখিয়ে দিলো।

"তোমাকে না আমি বলা করেছি, এখনকার মত নেমে পড়বে।

আর্তনাদ খুব কথা নেই। নিচে গিয়ে বসে দাঁড়িয়ে রইলেন।

"এইভাবে রাত জেগে পড়লে শরীর খারাপ হবে, খাদ্য নষ্ট হবে। তোমার খুব অন্যায় হবে, বুঝলে?

আর্তনাদ তখনো নীরব। আদৌ এ সবের কোনো কিছু বুঝতে পারছেন, না। কিন্তু হাবভাব এইরকম তাঁর চোখের পাতায় এ বিষয়ে খুব আগ্রহ নেই, এবং তিনি ঠিকভাবে বলতে পারছেন।

কিন্তু সত্যসত্যই এইভাবে রাত জেগে পড়ার কোনো প্রয়োজন হলোনা। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্তি পেতে হয়। আর্তনাদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হলো না। এইভাবে অনিয়মে-অনিয়ম করে রোজ পড়া-শুনা করে তাঁর শরীর সুস্থ হলোনা। মাথা ধরেই থাকে। কিছুদিন পরে তাঁর কঠিন অসুখ করলো। মাথার অসুখ। আত্মীয়স্বজন সকলকে খবর দেওয়া হলো। তিনি জেন দ্বিতীয় বারের জন্য ছাত্র।

তিনি বলে, এই অসুখে ভুগলেন। অনেকদিন কাজকর্ম বন্ধ থাকার জন্য তাঁকে অনেকদিন বাইরে পাঠিয়ে রাখতে হয়েছিল। সেখান থেকে বেশ সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু কিছুদিন যেতে না যেতেই সেপ্টেম্বর মাসের প্রথমেই

তিনি টাইফয়েডে ক্রমে আক্রান্ত হলেন। সামনেই শেষ পরীক্ষা। ক্লাসমেটদের ইচ্ছা ছিলনা আতাহেরই যে মূল পরীক্ষা দেবে। কিন্তু আতাহেরকে পরীক্ষা থেকে কিছুতেই নিবৃত্ত করা যেতনা। শেষমেষ পরীক্ষায় বসে তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন।

space

বি. এ. ক্লাসে আতাহের 'A' কোর্স নিলেন। পাঠ্যতালিকায় ছিল ইংরেজি, বাংলা, সংস্কৃত, দর্শন, ইতিহাস ও আবশ্যিক বাংলা। সব মিলে প্রথম দিন অবশ্য পাঠ্য আর বাকী অভিরুচি মতো পরীক্ষার্থীকে কোনো বিষয়ে পরীক্ষা দিতে হবে। ছাত্রদের পড়তে হবে মোট পাঁচটি বিষয়। পরীক্ষা হলো নয়টি পাঁচটি বিষয়। উপরোক্ত ও বি. এ. পরীক্ষায় তিনি আশানুরূপ ফলাফল করতে পারেন নি। তাই দ্বিতীয়বার তিনি দু সংকল্প করলেন বি. এ. পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণী অধিকার করতেই হবে। তিনি ইংরেজি, অর্থ, সংস্কৃত, দর্শন, আবশ্যিক বাংলা — এই পাঁচটি বিষয় নিয়ে বি. এ. পড়তে লাগলেন। এই পাঁচটিই ছিল অনার্স বিষয়।

প্রেসিডেন্সি কলেজের তখন সুনাম শুধুমাত্র আলো ইংরেজিয়ান দ্বারা। আবশ্যিক বাংলার ক্লাস তিনিই নিতেন। আতাহেরের আগে কয়েকজন ছাত্র এই বিষয় প্রথম করেছিলেন। আতাহের তাঁর প্রিয় ছাত্র। একবার তিনি আতাহেরকে তাঁর কবিতা করে পড়াবেন বলে বললেন। প্রায় দিনেই সভার হলো। কবিতাটি বর্ষণ নয়। সুনীলদের 'হারিয়ে যেতে' কবিতাটি

খুব অধিক। আমীর হাতের কাছে কোরবানী করা হইবে। কিন্তু এরূপ
ছিলেন প্রকার অসম্ভব হয়।

অধ্যাপক দুঃখ পড়াশুনা।

ছাত্রগণ নিম্নলিখিত ভাবে

প্রথমতঃ মনে তিনি পাঁচজন পাশী পাঠিয়ে দেন। পাশের পর
পাশ উঠিতে থাকে, আর বলেন, এমন দুঃখ থোকা। ? আর কোথাকার কি
ব্যাপার?

দ্বিতীয় সকলে নির্বাক ভাবে অধিকার আর অধ্যাপক দুঃখ পান। কিন্তু
তাদের মধ্যে একজন ছিলেন যাঁর কাছে অবশ্যই কিছুই ছিলনা। তিনি ধার্মিক।
এ বিষয়টি তাঁর আগে থেকেই ধরা ছিল। এই অধ্যাপককে অনুসরণ
করতে তাঁর কিছুমাত্র অসুবিধা হলো না। কিন্তু বাকীদের দুঃখের সীমা
ছিলনা। শেষে তাদের একজন ধার্মিকের কাছে গিয়ে বসে পড়েন।

আঙ্গুরের আর অধ্যাপক দুঃখ।

একজন ছাত্র, অপরজন অধ্যাপক।

একজন ধৈর্যশীল, অন্য অধৈর্যশীল; অন্যজন জ্ঞান-তপস্বী।

অধ্যাপক দুঃখ তাঁর জ্ঞানের ভাণ্ডার উজাড় করে দেন, আর
তাঁর ধৈর্যশীল ছাত্রটি নিশ্চিন্তে একাগ্রচিত্তে গ্রন্থ করে জ্ঞান-সাধনা।
এইভাবে অধ্যাপক দুঃখ দুইজনের মধ্যেই আত্মোপলব্ধির চিত্র এঁকে পড়িয়ে
শেষ করে দুঃখ ও জ্ঞানের অপূর্ব তাদের ছাত্রকে পড়িয়ে দিয়েছিলেন। দুঃখ ভাল

এই কারণেই তিনি গণিত সম্বন্ধে অনেক মৌলিক গবেষণা করে বিশ্ববিখ্যাত বহু পণ্ডিতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। সেই সময়েই আন্তরেশ 'রিমানিক সেক্সান' সম্বন্ধে তিনি আলোচনা করে লিখেছিলেন। তাঁর লেখা এই বইখানি অনেক কাল যাবৎ পাশ্চাত্য অর্থাৎ, পরীক্ষার অত্যন্তম পাঠ্যপুস্তক ছিল। এ বড় গৌরবের কথা নয়।

বি. এ. ক্লাসে পড়বার সময় থেকেই আজকাল পরীক্ষার ফিসের মত ফিসের ভয় তিনি আর কখনো করে পড়েননা, অথবা অত্যধিক পরিশ্রম করেন না। এসব থেকে তাঁর দৈনিক কার্যক্রম দাঁড়ায় এইরকম: প্রথম - খুব ভোরে উঠে গোল করে বিছানা গোটানো; দ্বিতীয় - ব্যায়াম। বিকেলবেলায় তিনি মুগুর ভাঁজতেন। এইভাবে শরীরের নিয়মাবলী খুব অল্পের মধ্যেই তিনি শেষ করতে লাগলেন। তারপরে তিনি বললেন, ছাত্রজীবনে লেখাপড়ায় যতটা মন দিতে হবে তেমনি মনোযোগ দিতে হবে শরীরের দিকে, স্বাস্থ্যের দিকে। শরীর নীরোগ না থাকলে অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটবে; অধ্যয়নে বিঘ্ন ঘটলে পরীক্ষায় আশানুরূপ ফললাভ হবে না।

তাঁর ছাত্রজীবনে আমরা আর একটা জিনিস দেখতে পাই। সেটি হচ্ছে সময়ের সদ্ব্যবহার। ছেলেবেলা থেকেই তিনি বৃথা সময় নষ্ট করা একেবারেই পছন্দ করতেন না। তাঁর সময়ের একটি চমৎকার আন্দাজও তখনো জন্মেছিল। সাধারণতঃ তিনবার ঢুলতে হোচ্ছিল - অমূল্য মুহূর্তগুলো নিয়েই মানুষের জীবন। পড়বার সময় তিনি নিজে একটি ইংরেজি কবিতায় পড়েছেন: 'But time and tide for no man stay' - সময় আর নদীর স্রোত কারো জন্য অপেক্ষা করেনা, এদের থেকে সময়ের মূল্যটা আজকাল তিনি খুব বেশি করে বুঝেছিলেন।

১৮৮৪।

আশুবাবুর ছাত্রজীবনে একটি স্মরণীয় বৎসর। বি.এ. পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন। শুধু তিনি শীর্ষস্থান অধিকার করা ও পরীক্ষার ফলাফল বিশ্লেষণ করিয়াই তিনি ক্ষান্ত হইলেন না। সকলের কিন্তু মনে হইল, দীর্ঘদিনের পরিশ্রমের ফলে ছিপ্ ছিপে নবনীই যেন পরীক্ষকদের চমৎকৃত করিল। অনেকে, বিশেষ করিয়া রসায়নে অনেক ছাত্রই অত নম্বর পেয়ে যাবেন সত্য, কিন্তু দর্শনের পরীক্ষায় অত নম্বর ত কাহারও যেমন ছাত্রই আসে না। এমনকি স্বয়ং, ফেলো ও অধ্যাপকদের মুখে মুখে যেন আশুবাবুই। আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব সকলেই তাঁর এই কৃতিত্বে সুখী হলেন। সকলের সুখী হলেন পিতা গঙ্গাপ্রসাদ। জমিদার হয়ে অধিকার করার জন্য আশুবাবু পেতেন টাকা ছুটি পেলেন আর পরীক্ষায় সর্বোচ্চ নম্বর পেয়ে লাভ করলেন 'হরিশ্চন্দ্র প্রাইজ'।

প্রেসিডেন্সি কলেজের উজ্জ্বলতম ছাত্র এখন আশুবাবু।

কয়েকদিন আগে বি. এ. পরীক্ষা হয়ে গেল। আশুবাবুর নিয়মানুসারে ফেব্রুয়ারি মাসেই এম.এ পরীক্ষা হওয়ার কথা। ১৮৮৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই ইংরেজিতে এম.এ. দেবেন বলে আশুবাবু স্থির করেছিলেন। বি.এ. পড়ার সময়ই ইংরেজিতে এম.এ. পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকগুলির তিন পত্রে শেষ করেছিলেন। কিন্তু অধ্যাপক রো সাহেবের ইচ্ছা ছিলনা যে, আশুবাবু একসঙ্গে দুটি বিষয়ে পরীক্ষা দেন।

"কেন স্যর, দিলে ক্ষতি কি?

তাহলে কি. ম. ত ইংরেজিতে প্রশ্ন হতে পারবে না।

অধ্যাপকের কথা আবার হলো। প্রথম চেষ্টাতেই বাজি পেলেন। তিনি অবশ্য ইংরেজিতে এম. এ. পরীক্ষা দিলেন না। ঐ বছর থেকেই নিয়ম হয়, যারা এম.এ. পরীক্ষা সোজাসুজি আসবে না হয়ে নতুনের আসবে হবে। পরের বছর আশুতোষী আসতে এম.এ. পরীক্ষা দিয়ে সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করলেন ও সোনার মেডেল পেলেন। আশুতোষীর ঐতিহ্যমণ্ডিত শেষ ছেলে। একটি বিষয়ে এম এ. পরীক্ষা দিয়ে তিনি সন্তুষ্ট হলেন না। ১৮৮৬ সালে তিনি বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত ও পদার্থবিদ্যা – এই তিন বিষয়ে এম.এ. পরীক্ষা দিলেন। পরবর্তীকালে অবশ্য দুটি বা তিনটি বিষয়ে এম.এ পরীক্ষা দেওয়ার রীতি আর ছিল না। আশুতোষীই এই ব্যবস্থা একাধিক বিষয়ে পরীক্ষা দেওয়ার পথ প্রশস্ত করলেন।

বলেছি, তাঁর ছাত্রজীবনের শুরুতেই আশুতোষ সংকল্প করেছিলেন, তিনি P.R.S. হবেন – সুযোগমিত পরীক্ষা দেবেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে P.R.S. পাওয়া খুব সম্মানের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮৫৭ সালে। এর ঠিক ন'বছর পরে, ১৮৬৬ সালে, প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ নামে বোম্বাইয়ের কোনো বিত্তবান ধনী ব্যক্তি সরকারের হাতে দু'লক্ষ টাকা জমা দেন। এই টাকার উদ্দেশ্য ছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করা। তবে সরকার ঐ টাকা গ্রহণ করেননি বিশ্ববিদ্যালয়ের অছিপরিষদের হাতে। তাঁরা সেই টাকা বৃত্তিহিসেবে ব্যয় করেন যোগ্য ছাত্রের নামেই এম পরীক্ষার সূচনা করেন। সবার

নাম হলো P.R.S. বা প্রেসিডেন্সি রায়টাঁদ চুঁচোসিপ পরীক্ষা। তখনকার দিনে দু'লাখটাকার কোম্পানির কাগজের সুদ হলে বছরে দশহাজার টাকা। ইউনিভার্সিটি পরীক্ষার পর এই নতুন পরীক্ষায় যিনি প্রথম হবেন তাঁকে এই সুদের দশহাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে। এত বড়ো প্রাইজ পৃথিবীর আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে নেই।

যথাসময়ে আমরা সবাই P.R.S. পরীক্ষা দিলাম। বিশুদ্ধ গণিত, মিশ্র গণিত আর পদার্থবিদ্যা – এই তিনটি বিষয়ে P.R.S. পরীক্ষা দেবেন। সর্বোচ্চ নম্বরপাবার জন্য সব কটিতে পরীক্ষা দিতে হবে। কিনি সেইবারই প্রথম হবেন বলে আশা করেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য হয়ে দেখলাম, তিনি পুরস্কার পাবার সম্ভাবনা হারিয়ে ফেলেছেন। অঙ্কে যে তাঁর আজ তেমন কিছু নয়, বুঝতে পারলাম তাঁর ডায়ালগ্রাফ ইলেকট্রিসিটি' বইখানা পড়তে দিয়ে। এতদিন যে অঙ্কিত সমিতি নিয়ে তিনি মেতে ছিলেন তা যে আজকেই তখন বুঝতে পারলেন না।

উপায় কি? নতুনদিন বইখানা নিয়ে কিনি লেগে যাবার প্রস্তাব ইনিয়াটের মতই। তাঁকে বললেন তাঁর অনুবিধার কথা। অধ্যাপক বললেন, এই বই তাঁর পড়া চাই। তাঁদের সময় এটা কোর্সে ছিল। তাই তাঁর পক্ষে অনুপযুক্ত পরীক্ষক পাওয়া শক্ত।

অগত্যা আমরাই ফিরে এলাম। বুঝলাম এলেন ঐশিক্ষার মত অনুবিধা। তিনি কিনি বিশ্বাস কোয়ান্টাম অধ্যাপক লেখাকে পরীক্ষা নিলেন। তখন বললেন: 'ইথাল আর দু'দিনের অধ্যাপক অ্যাবারডিয়ন পড়াতে পারে। তাকেই ডাকি।'

বর্ষীয়ান। ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয় ভাবে যুক্ত ছিলেন না, যেমন ভাবে যুক্ত ছিলেন নেতাজি সুভাষের সঙ্গে। তিনি ছাত্রদের মত নন। যেকোনো প্রশ্নে তাঁর বর্ষীয়ান মনে ভেবে নেওয়া তাঁর প্রকৃতিবিরুদ্ধ। যে কোনো বইখানি নিয়ে পড়তেন। ভালো করেই পড়তেন। দৈবক্রমে যাদুকরীবশায় তিনি আমার অনুরোধের সঙ্গে একটি অনুকূল ভাব মিশিয়েছিলেন; তাতেই তাঁর খুব সুবিধা হয়। তারপর চলল অধিক রাতের দুরন্ত ও বাঁধন ছিঁড়ে অক্লান্ত। পড়লেন লাগাতার, পড়লেন বেপরোয়া!

এইভাবে প্রস্তুত হয়ে পরের বছর তিনি I.P.S. পরীক্ষা দিলেন। তাই বছরেই তিনি বিভাগে ১ম. ২. পরীক্ষা দিয়ে ছিলেন। দুটো পরীক্ষাই একসঙ্গে দিলেন। প্রথম সপ্তাহে সোমবার থেকে রবিবার পর্যন্ত সারাদিন মুখে পরীক্ষা হলো। তারপর একদিন বিশ্রাম নিয়ে আবার সোমবার থেকে শনিবার পর্যন্ত ১ম. ২. পরীক্ষা দিলেন। এই কয়েকদিন সকাল আটটা থেকে সন্ধ্যে বেলা আসতেন, সারাদিন নিজে সন্ধ্যের জন্য গাড়ি নিয়ে থাকত।

যথাসময়ে পরীক্ষার ফল বেরোল।

আশ্চর্যজনক ভাবে কয়েক বৃদ্ধি নাও করলেন।

পরীক্ষকরা তাঁর উত্তরপত্র দেখে অত্যন্ত প্রীত হন।

আশ্চর্যজনক ভাবে সাফল্যের গল্প সার্থক হলো।

[illegible]

॥ পাঁচ ॥

এ বছর তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বৃত্তি নিয়ে বিলেত যান। সেই থেকে সারদা
চরণের জীবনে বিলেতফেরার পর্ব শুরু হয়। সেই বছরেই তিনি এশিয়াটিক
সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হন। পরে লন্ডনের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি ও
এডিনবরার রয়্যাল সোসাইটির সভ্য হন। তাঁর আগে আর কোনো বাঙালী
এ গৌরবের এই দুটি সম্মান লাভ করেননি। তখন তাঁর বয়স কতই বা
হবে। এই বয়সে এমন সম্মানলাভ খুব কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে থাকে।

১৮৮৬ সালে সারদা চরণের জীবনে আরো একটি ঘটনা অবিস্মরণীয়
হয়ে আছে। এই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে তাঁর জীবন সঙ্গিনী হয়ে
আসেন ভোলানাথ দেবী। ভোলানাথ দেবী স্বামীর সুখে দুঃখে সহধর্মিণী ছিলেন।

বি. এ. পাশ করবার পর সারদাচরণ সিটি কলেজে আইন পড়তে
থাকেন এবং দু'বছর পর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। এই একই সময়ে
তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে 'টেজার্স ল লেকচার্স' বিষয়টিকেও অধ্যয়ন করেন।
এইজন্যে তিনি পরপর তিন বছর সুবর্ণপদক আইন, বিধুভূষণ ও টেজার্স
ল পরীক্ষায় জয়ী হয়ে তিনটি সোনার মেডেল লাভ করেন। এইভাবে
পরপর তিনবার সোনার মেডেল লাভ করে সারদাচরণ সকলকে বিস্মিত
ও চমকিত করেন। [সারদাচরণ যাদের তিনি মাতা বৃহস্পতিতুল্য বিদ্বান ছিলেন।
তাঁদের তিনি সংস্কৃত কলেজের বিখ্যাত পণ্ডিত মধুসূদন স্মৃতিরত্নের কাছে মনু,
যাজ্ঞবল্ক্য, বিষ্ণুসংহিতা, নারদীয় প্রভৃতি ধর্মশাস্ত্রের পাঠ নিয়েছিলেন।]

আইন পাশ করার পাঁচ বছর পরে, ১৮৯৩ সালে তিনি অনার্স

ইন্ট' এবং ১৯১৪ সালে C. I. E. (জীবন অবদান) উপাধি লাভ করেন। এর থেকেই তোমরা বুঝতে পারছ যে, ত্রিশ বছর পেশা হওয়ার আগেই আশুতোষ গিলার অধিকারী নবী সরস্বতীর কৃপায় বিদ্যাসাগরে লাভ করেন। কলকাতা শিক্ষাবিভাগের যিনি একদিন তাঁর ছাত্রজীবন আরম্ভ করেছিলেন, সেই আশুতোষই আর Asutosh Mookerjee, M.A., P.R.S., D.L., F.R.A.S., F.R.S.E. – এই নামে বিশ্বজনসমাজে পরিচিত হলেন। তাছাড়া তিনি আরো লাভ করেছিলেন – অনেকগুলি বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে D. Sc. ও Ph.D. উপাধি দান করে সম্মানিত করেন। নবদ্বীপের পণ্ডিতসমাজ তাঁকে 'সরস্বতী' উপাধিতে ভূষিত করেন; বিক্রমপুরের পণ্ডিত-সমাজ দিলেন 'শাস্ত্র-বাচস্পতি'; কবিকবির বৌদ্ধসংঘ দিলেন 'সদ্ধর্মাকর-প্রবর্তী' আর সরকার দিয়েছিলেন 'Knight' ও C. S. I.

বিক্রমপুরের

আর ও পাকা হইবে বলিয়াই বলে আশুতোষের নামটি এই রকম দাঁড়ায়: Sir Asutosh Mookerjee, Saraswati, Sastravachaspati, Sambuddhagamachakravartin, Kt. C. S. I. M.A., P.R.S., D.L., D.Sc., Ph.D., F.R.A.S., F.R.S.E.

রবীন্দ্রনাথ তাই লিখেছিলেন:

'সরস্বতীর চিত্তবীণায়, আশুতোষ, বিদ্যার সরাজ,
তোমারে আপন নামে সম্মানিত করেছে ধরণী।'

#Space#

প্রেমচাঁদ রায়চাঁদ বৃত্তি পাওয়ার পর আশুতোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক হওয়ার জন্য দরখাস্ত করলেন — এম.এ. পরীক্ষাতে গণিতের পরীক্ষক হওয়ার ইচ্ছাই তাঁর ছিল। তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র। জৌরবোজ্জ্বল তাঁর ছাত্র-জীবন। বহু সিন্ডিকেটে তাঁর আবেদন-পত্র নিয়ে বেশ বিতর্কের সৃষ্টি হলো। সকলে একমত হতে পারলেন না। তাঁদের আপত্তির প্রথম কারণ, আশুতোষ অভারতীয়; তিন সংস্কৃত, আরবী, ফার্সী প্রভৃতি বিষয়গুলি ছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ পরীক্ষা-গুলির পরীক্ষক ইংরেজরাই করা হতো। তার এই নিয়মই ছিল। দ্বিতীয় কারণ, বয়স কম — মাত্র ত্রিশ বছর। কিন্তু সিন্ডিকেটের সাতজন সভ্যের মধ্যে ছয়জন তাঁর পক্ষে ছিলেন; এই ছয়জনের মধ্যে দু'জন ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়[১] ও ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার।

আশুতোষের আশা পূর্ণ হলো।

তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন।

অভারতীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এ.এ.র প্রথম পরীক্ষক। গণিতে মাত্র প্রথমশ্রেণীর কতিপয় বিষয়ের পরীক্ষক হওয়া যায়। মার্চ মাসে তিনি পরীক্ষক নিযুক্ত হলেন; নভেম্বরে পরীক্ষা গৃহীত হলো। সকলেই উদ্‌গ্রীব ছিলেন আশুতোষের খাতাগুলি দেখবার জন্য। স্যার গুরুদাস স্যার আশুতোষের প্রশ্নপত্রের প্রশংসা করলেন ও প্রশ্ন দেবার পদ্ধতি দেখে চমৎকৃত হলেন। সেই থেকে আশুতোষ পাঁচ বছর কাল পর্যন্ত বি.এ. ও এম.এ.র পরীক্ষক ছিলেন।

---

[১] অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের অথম ভারতীয় উপাচার্য ও হাইকোর্টের অন্যতম বিচারপতি। তিনি এফিল [illegible]

স্যার আলফ্রেড ক্রফট ছিলেন শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র হিসাবে আজমতীর উপর তাঁর দৃষ্টি ছিল। সে বছর সিনি ম.ম. পাশ করেন সেই সূত্রেই সুপারিশ ক্রফট সাহেব তাঁকে ডেকে পাঠালেন। আজমতী তাঁর অফিসে গিয়ে স্যার আলফ্রেডের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন।

- আপনাকে আমরা শিক্ষাবিভাগে একটা চাকরি দিতে চাই।
- কি রকম চাকরি?
- অধ্যাপকের চাকরি; প্রেসিডেন্সি কলেজে।
- মাইনে কত পাব?
- 400 per scale - Rs 250/- per month.
- সরকারি চাকরি সম্মানের কথা, কিন্তু এই মাইনেতে রাজী নই।
- কেন? এটাই তো সরকারি কলেজের সুযোগ্যদের গ্রেড।
- তা জানি। কিন্তু আমাকে সুযোগ্য অধ্যাপকদের সমান গ্রেড দিতে হবে। তাছাড়া আমাকে বিলাতের প্রেসিডেন্সি কলেজেই রাখতে হবে, মাইনে কমানি করা চলবে না। আর আমেরিকা আমার এই শর্ত মেনে নিতে হবে, নইলে আমি রাজী।

কিন্তু বাঙালি ছাড়া সরকারি চাকরি অসম্ভব। আর ইংরেজ অধ্যাপকের সমান বেতন দেওয়া সরকারের সাধ্যে নয়, এটা জানতে পারেন সুপারিশ করেছিলেন। তবে ক্রফট সাহেব আশ্বাস দিলেন, এটা হাত অসম্ভব হতে পারে। আজমতী

কিন্তু আনিকেতের মধ্যে সেসব না। তিনি শুধু ডিরেক্টরকে বললেন, তবে আমি প্রতিযোগী হবার ইচ্ছা করি না।

- তাহলে আপনি কি করবেন?

- আমি হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করব।

আশুতোষ তাই করলেন — উকিল হলেন। ১৮৮৮ সালে তিনি হাইকোর্টের অ্যাটর্নিদের নাম লেখালেন। শুরু হলো তাঁর কর্মজীবন।

যার ঘরোয়াপড়া ছেড়ে শুধু হাইকোর্টের ব্যারিস্টার তাঁর পক্ষে। তুলনা আশুতোষ তাঁরই প্রতীক্ষা দুইয়ের আগে থেকেই শিক্ষানবিশি নিয়ে হয়েছিলেন। তাই তাই তিনি ব্যবসায়ীদের বিশ্বাস অর্জন করেছেন; তাই তাঁর আজ দিনের ঘটনাই তাঁর পসার বয়ে আনে। আইন ব্যবসায়ে আশুতোষের পসার ভিন্ন বৃদ্ধি পেয়েছিল যে তাঁর আয়কর উপার্জন দশহাজার টাকা ছাড়িয়ে যায়। এই সময়ে আশুতোষের উকালতিতে এইরূপ সাফল্য দেখে সকলেই বলেছিল যে, তাঁর নামের শেষাক্ষরের ভিন্ন টেনে দিলেই যে ওকালত তাঁকে হাইকোর্ট পাঠিয়েছে! সেই থেকে তাঁর অর্থের নয়ন্ত্রণ সব কাজ-নিয়ের (মধ্য) দিয়েও আমরা অনুভব করছি তাঁর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত।

Space

অধ্যাপনা পরিবেশ করতেও আনিকেতের প্রতি আশুতোষের মুখোশ নিয়ন্ত্রণ প্রায় পাওয়া। সেই সময়ে তাঁর অন্য আগ্রহ উদ্ভব করেছি। নিজে যখন হাইকোর্টের ঘরোয়াপড়া ছেড়ে অবীত শিক্ষানবিশি নেইসময়ে আশুতোষ

একদিন খবরের কাগজে একটা নিলামের সংবাদ পড়লেন। পড়ার কারণ উচ্চপদস্থ ইংরেজ সরকারচারীর মৃত্যুর পর তাঁর বহুমূল্য সংগৃহীত গ্রন্থরাজি নিলামে বিক্রি হবে। যিনি ছিলেন আর্কেওলজি-রেকর্ডের; অক্সফোর্ডে গবেষণার চর্চা করতেন। তাঁর কথা আজকাল তত ছিলেন। সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপিত বইয়ের তালিকার মধ্যে ফরাসীবিপ্লব লেখা উচ্চাঙ্গ গবেষণার দুষ্প্রাপ্য ও দুষ্প্রাপ্য বইয়ের উল্লেখ ছিল। এ বই দুখানি সংগ্রহ করতেই হবে, স্থির করলেন আজকাল।

নিলাম যেদিন ডাকা হল সেদিন যথাসময়ে আজকাল হাজির। উপস্থিত। অবশেষে ওই বই দুটির 'ডাক' আরম্ভ হল। ক্রেতা বড় বিশেষ নেই। দীন ও দুঃখজন বই, এত আবার ফরাসীবিপ্লব। কেই বা কিনবে? তাই আজকালের আশা ছিল যে কিনি নিশ্চয়ই এ দুখানি সংগ্রহ করতে পারবো। কিন্তু ফল যখন হল না খুব নিরাশ হয়ে গেলো। নিলাম আরম্ভ হবার আগে একজন ইংরেজ ভদ্রলোক এসে নিলামদারকে অনুরোধ করে রেখেছিল যে, এই দুখানি, যত দামেই উঠুক, যেন তাঁর বলে দেওয়া হয়। 'ডাক' যখন আরম্ভ হল, তখন দেখা গেল যে, আজকাল যত দাম বলেন, নিলামদার তার চেয়ে একটাকা বেশি ডাকতে থাকে। আজকাল একশো টাকা পর্যন্ত বলে শান্ত হলেন; নিলামদার একশো এক টাকা হেঁকে যখন হাঁপিয়ে বসে পড়িল। দ্বিতীয় বইটির কথা আজকাল একশো পঞ্চাশ টাকা পর্যন্ত বলে দিলেন; নিলামদার আবার যখন তার চেয়ে একটাকা বাড়াল।

দিয়ে একশো টাকার টাকায় ডাকে সেট করলেন।

আশুতোষের কৌতূহল হলো। তিনি জানতে চাইলেন এই বই দুখানির লেখক কে? উত্তর দিলেন- কিরণচন্দ্র মিত্তির ওকেনেলি। তদ্দিনে বই দুখানির জন্য নীলামদারের কাছ থেকে দুশো কয়েক টাকার একটি বিল পেয়ে ওকেনেলি সাহেবও যারপর নাই বিস্মিত হলেন। ব্যাপার কি! শুনলেন - হাইকোর্টের তরুণ ব্যবহারজীবী আশুতোষ মুখোপাধ্যায় এর অন্যতম লেখক ছিলেন। পরের দিন হাইকোর্টে এসেই তিনি ডক্টর রাসবিহারী ঘোষকে আশুতোষের কথা জিজ্ঞাসা করে তাঁর সব পরিচয় জানতে পারলেন। সেদিনই একদিন ডক্টর ঘোষালের কাছ থেকে একখানি পরিচয়পত্র নিয়ে আশুতোষ গেলেন ওকেনেলি সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। পরিচয়পত্রটি খুলবার দরকার হলো না, কিরণচন্দ্র নিজে বললেন - "এই বই দুটিই তোমার পরিচয় যথেষ্ট করছে! Let me present them to you, my young friend." এই বলে তিনি সেই দুটি বই আশুতোষকে উপহার দিলেন। আশুতোষ তাঁর এই সহৃদয় ব্যবহারে মুগ্ধ হলেন।

Space

বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাক পড়বে - এই ছিল আশুতোষের আর একটি বহু আকাঙ্ক্ষা। এটা করতে হলে এই বিদ্যামন্দিরের সঙ্গে সংশ্লেষ আসা দরকার। আশুতোষ এইবার সেই চেষ্টা করলেন। মুখুয্যে বংশের তাঁর যতো কর্ম রাসবিহারীপ্রসাদই সর্বপ্রথম তাদের সঙ্গে মেলবার ভক্ত অনেকদিন গ্র।

এই সময় তাঁর কাছে বিশ্ববিদ্যালয় সংক্রান্ত যেসব সরকারপত্র, রিপোর্ট আর যোগাযোগ-সিন্ডিকেটের সভার মিনিট (Minutes) আসত সেগুলি আশুতোষ অবসরসময়ে খুব মনোযোগের সঙ্গে পড়তেন।

আশুতোষের নতুন কিছু সৃষ্টি করার না। বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়া থেকে যে ঐতিহাসিক ইতিহাসটি ঘটে তাঁর দরকার। কি করে সেটি ঘটে গেল? অবশেষে একদিন অত্যাশ্চর্যভাবে সেই সুযোগ উপস্থিত হলো। প্রথম সাহেবের লাইব্রেরি নিলামে বিক্রী হবে, খবর পেলেন আশুতোষ। এই সাহেব আর কেউ নন -- কলকাতার ব্যবসায়ী ব্যারিস্টার ও প্রেসিডেন্সি কলেজের আইনের অধ্যাপক মিস্টার ডব্লু. এ. অন্‌স্লো। সম্ভবতঃ ভারতে তাঁর মৃত্যু হয়। ইনি মেকলের একজন বন্ধু ছিলেন।

নিলামের দিন আশুতোষ সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন। আইনের বইগুলি অল্পসময়ের মধ্যেই বিক্রী হয়ে গেল। একপাশে আরো কতকগুলি বই স্তূপীকৃত ছিল। সেদিকে তেমন ভিড় ছিল না -- সবাই ধরে নিয়েছে ওগুলি বাজে বই। তখন সময় আশুতোষের চুপি চুপি কিছু পড়ুন সেই দিকে। তিনি একে একে উলটিয়ে পালটিয়ে দেখলেন সেগুলি বিশ্বকিড়ালয়ের ক্যালেন্ডার ও মিনিটস্। অন্‌স্লো সাহেব একেবারে গোড়া থেকে প্রতিটি সংখ্যা করে রেখেছিলেন। সংখ্যাগুলি তো আশুতোষ এতদিন খুঁজছিলেন। নিলামের অঙ্কটা কম পেলেন। বেশি দাম দিয়ে সেগুলি কিনে নিয়ে আশুতোষ মনে মনে কষ্ট চিন্তা। বাড়িতে দু'মাসের মধ্যে সেইসব ক্যালেন্ডার ও মিনিটস্ পড়ে ফেললেন। আশুতোষ

বিষয়, এমন নীরস বিষয় পড়তে তাঁর আকর্ষণ নেই। তাঁকে ছাড়া-সভাতেই বিশ্ববিদ্যালয়ের যাবতীয় কাজ তাঁর দ্বারা হয়ে [redacted] গিয়েছিল।

আচার্যজী যে খুব প্রসন্নচিত্তে প্রস্তাবটি পাশ করেন তা নয়। সভাবর্তন গৃহে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মিস্টার সি.পি. ইলবার্ট নৈশ-ভোজের খুব আয়োজন করেছিলেন। ইনি বরাবরই আচার্যজীর প্রতি বিদ্বেষ-পরায়ণ ছিলেন। মিঃ ইলবার্ট বড়লাটের ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সভ্য ছিলেন। শাসনবিভাগেও তাঁর প্রভাব ছিল যথেষ্ট। আহার সাঙ্গ হলে একদিন তিনি আচার্যজীকে তাঁর নিজের গাড়িতে তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, আমি তোমার কি উপকার করতে পারি?

—আপনি ইচ্ছা করলে আমার অনেক উপকার করতে পারেন। কিন্তু আমি অন্য কিছুর প্রত্যাশী নই। সেনেটের সভ্য হতে ইচ্ছা করি।

—কিন্তু [illegible] অধ্যাপক, ও ভুলে যাবে।

—আপনি। আমার অর্থের প্রলোভন নেই। আমি শুধু চাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উপকার করতে।

আচার্যজীর কথার আন্তরিকতা মিঃ ইলবার্টের মনে স্পর্শ করল। তাঁকে আশ্বাস দিয়ে তিনি বললেন, আমি তোমাকে বিশ্ব-বিদ্যালয়ের 'ফেলো' (Fellow) নিযুক্ত করে দেব, তোমাকে ভাবতে হবে না।'

সে কিছুকাল পরেই ইলবার্ট সাহেব বিলাত চলে গেলেন। অবশ্য

যাওয়ার আগে আজহারীকে মাত্র 'ফেলো' নিযুক্ত করা হয় এবং তিনি সুপারিশ করে যেতে ভোলেন নি। কিন্তু কেউ কেউ খুশি হননি। সেনেটের প্রবীণ সদস্যদের অনেকেই তাঁর বিরোধী অবস্থান করেছেন। তাঁরা বলেছেন যে, আজহারীর জন্ম হয়, এত কম বয়সের কাউকে 'ফেলো' করা যায় না।

আরো কিছু দিন পেছনে যান।

আজহারী বিলাতে ড্রি: ইকবালকে একটি চিঠিতে জানান যে, তিনি এখন অনেকগুলো বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফেলো' নিযুক্ত হতে পারেন। চিঠির উত্তর এল: 'লর্ড লায়ন্সডেন নতুন ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে এসেছেন। তাঁকে আপনি যেসব কথা লিখেছেন বলে দিলাম।' আজহারী আশ্বস্ত হলেন। এর কিছুকাল পরেই আজহারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ফিরে 'ফেলো' নিযুক্ত [redacted] হন। এই অত্যন্ত সম্মান কম বয়সে জীবনীকারের কাছে প্রশ্নাতীত আজহারীর পরম হিতাকাঙ্ক্ষী দুই ব্যক্তি মনে হয়। তিনি তাঁকে সর্বদাই অভিনন্দিত করে বলেছিলেন: এইবার সিন্ডিকেটে ঢোকা কই।

জীবনের পথে ধাপে ধাপে অগ্রসর হতে হয়, একথা আজহারী বলতেন। এই আমরা দেখতে পাই যে, 'ফেলো' নিযুক্ত হওয়ার দু'বছর পরেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিন্ডিকেটের সদস্য মনোনীত হন। যেন তাঁর কাম্য মঞ্চে পাঁপিয়ে পড়ে। এর আগে এতবড় সম্মান এই পদে কেউ মনোনীত হন নি। তিনি যে কত সিন্ডিকেটের সদস্য হন, সে বছরে (১৯৩৯) আজহারীর পিতৃবিয়োগ হয়। মৃত্যুর পূর্বে সাহিত্যিক তাঁর প্রিয় ছাত্রের আরও দীপ্ত জীবনের সূচনামাত্র দেখে যেতে পেরেছিলেন।

॥ ছয় ॥

১৯০৪।

আশুতোষের কর্মজীবনে একটি স্মরণীয় বছর।

এই বছর তিনি কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি পদে নিযুক্ত হলেন। তখন তাঁর বয়স মাত্র তেত্রিশ বছর। তাঁর ঐশ্বর্যের আর একটি ইচ্ছা একদিন পূর্ণ হলো। হাইকোর্টের বিচারপতি পদ অত্যন্তকালীর সম্মানিত বলে সর্বত্রই স্বীকৃত। একদিন আশুতোষের বাবা সেই সুসংবাদ পেলেন। বাবা আজ বেঁচে থাকলে ছেলের এই কৃতিত্বে খুব খুশি হতেন।

আশুতোষ তাঁর মাকে কি বলে সম্বোধন করতেন তার একটি ঘটনা এখানে বলি। এই সময়কার ঘোড়ার দিনের কথা। যে ঘোড়ার ইংলণ্ডে সবচেয়ে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা রাজনৈতিক ছবে। লর্ড কার্জন ওই ঘোড়দৌড় বন্ধ করেন। ইংলণ্ডের ঘোড়দৌড়ের অভিযোগে উৎসবে কলকাতা ঘোড়দৌড়ের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে তিনি আশুতোষকে বিশেষ সাক্ষাৎকার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ছেলের বিশেষ সাক্ষাৎকারে মায়ের বিশেষ আপত্তি। এই সময়ের আবেদন নিয়ে মায়ের সঙ্গে আলোচনা হলো।

আশুতোষ থাকেন বেলেঘাটায়। এখন যেখানে ন্যাশনাল লাইব্রেরি তখন সেটাই ছিল বড়লাটের বাড়ি। কলকাতা তখন ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী ছিল। বড়লাটের বাড়িকে বলা হতো বেলভেডিয়ার। আশুতোষকে কার্জন শিষ্টাচারের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। বড়লাটের নিমন্ত্রণের জন্য তাঁকে যথোপযুক্ত পোশাক পরিধান করতে হবে। বড়লাটের নিমন্ত্রণ রক্ষার অনুমতির কথা বুঝিয়ে বললেন।

কারন লো অনারক। ইংলন্ডের যুবরাজের করোনেশনে, উপস্থিত সাথে বড় মৌজের ব্যাপার। তিনি আজলেটকে বললেন, আপনি গান, আ-বে দিয়ে বলুন যে, আমি আপনাকে বিলাত যাওয়ার জন্য আদেশ করেছি।

"কিন্তু আমি চাই, আমার মা এই [illegible]

"[illegible]

-না। তিনি বললেন, আমার ছেলের ওপর আদেশ করার অধিকার, আমি ছাড়া আর কারো নেই।

-তাহলে আপনি এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন না?

-আমার অসুবিধার কথা তো আপনাকে বলেছি। আমার মা রাজী না হলে আমার পক্ষে এই নিমন্ত্রণ গ্রহণ করা অসম্ভব।

আজলেটের আর বিলেত যাওয়া হয়নি।

#Space#

উনিশ শতক বিচারপতির পদে অভিষিক্ত হলেন আজলেট। এর আগে ১৯২০ সালে অস্থায়ীভাবে কয় মাসের জন্য তিনি প্রবীন বিচারপতির পদে অলঙ্কৃত করেছিলেন। ছাত্রজীবনের মতো তাঁর এই কর্মজীবনও ছিল ঘটনাবহুল। তাঁর আগে যে কয়জন বরণীয় ব্যক্তি সভাপতি হয়েছিলেন তাঁদের প্রত্যেকে ঢাকাবাসীর চিত্তে, শহর কর্মকেন্দ্রে বিচিত্র এবং গুরু কোন না কোনরূপ বিশেষ খ্যাতি লাভ করেছিলেন। কিন্তু দেশ-বিদেশের খ্যাতনামা কোন পণ্ডিতের সঙ্গে বিচারপতি আজলেটের খ্যাতি যেন তাঁর দূরদৃষ্টিসম্পন্ন প্রতিভার

অধিকার করে নিয়েছিল।

আইন সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল বিশাল। প্রাচীন রোমান যুগ থেকে নিতান্ত আধুনিক সময় পর্যন্ত আইনের উদ্ভব ও বিকাশ — এই ইতিহাস তাঁহাতেবীর নখদর্পণে ছিল। প্রত্যেক দেশের বিচার-পদ্ধতি, সব আইন-কানুন সবই তিনি খুঁজানুপুঙ্খরূপে জানতেন। তাঁর মতে ইংলণ্ড ও আমেরিকার যুগ্মীয় বেঞ্চ ও বার এসোসিয়েশন ছোট ছোট মামলাগুলির নিষ্পত্তি ও আইন সম্বন্ধে প্রত্যেক আইনজীবীর জ্ঞানই ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ। যেমনি প্রধান প্রধান লোকের, আইন সুপ্রিম কোর্ট সম্বন্ধে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এর তাঁর বিচার ও বিচারের রায় (Judgement) পেশ করার আগ্রহ ছিল।

বিচারপতির আসনে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন অনেকেই। কিন্তু খুব কম লোকই তাঁর মতো এতো বেশি রায় লিখেছেন। জীবনের বিচারপতি ছিলে ৮০৩টি মামলার বিচার করেন। এর মধ্যে ৮০০ মোকদ্দমার রায় তিনি আদালতেই লিখিয়েছিলেন। তাঁর সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে যেসব রায়ই বিখ্যাত আর যেগুলোই বিখ্যাত নয়, তা বলা শক্ত। অধিকাংশ রায় তিনি নিজেই লিখতেন। কেবলমাত্র আইনের ব্যাখ্যার বিশ্লেষণের জন্য নয়, তার অপরিসীম সাহিত্যিক অভিব্যক্তি, এবং চমৎকার ভাষাজ্ঞানের জন্যই আদালতের প্রত্যেকটি রায়ই ছিল সুখপাঠ্য। এইজন্যই তো তিনি আইন-বিশারদ হিসাবে সারা পৃথিবীতে স্বীকৃতি পেয়েছিলেন।

বিচারপতির আসনে বসে তিনি কিরূপ ন্যায়নিষ্ঠা ও নির্ভীকতার পরিচয় দিয়েছেন সে সম্বন্ধে দুটো আদালতের উল্লেখ করছি। একবার

অভিনেতারা ইয়র্কশায়ারেই ট্রাসের সঙ্গে চন্দ্রকান্ত ঘোষ নামক ব্রিটিশ প্রজা মামলা হয়। এই মামলাটি তখন জনসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। ন্যায়ালয়ের থেকে বা অন্যান্যদের থেকে, ট্রাসের পক্ষ থেকে চন্দ্রকান্ত ঘোষের কর্মি দমন করা হয়। তিনি যে বিরুদ্ধে হাইকোর্টে প্রথমে মামলা দায়ের করেন। ইয়র্কশায়ারেই ট্রাসে তখন একটি প্রদর্শনীর আয়োজন; ইংরেজরাই ছিলেন এই প্রতিযোগিতার অধিকাংশ কর্তা। অভিনেতারা তাঁদের খুব খাতির করলেন। ডিরেক্টর মিঃ এইচ. বরদাস নামে একজন ইংরেজ তখন ছিলেন ট্রাসের ডেপুটি ম্যানেজার।

শহরের প্রধান প্রধান জায়গায় ট্রাসের উদ্বোধন করা হয়েছিল। যেখানে উদ্বোধন করা হয়েছিল তার কিছুদূরেই চন্দ্রকান্ত ঘোষের বাসস্থান। ট্রাসের পক্ষ থেকে এই বাড়ি দখল করে নেওয়া হয়। আবেদনে তিনি বলেছিলেন যে, তাঁর বাড়ি নিরাপদ দূরে অবস্থিত; তাই তাঁরা সেই ঘরে দখল করেছেন। ম্যানেজার ডরবর কিরকাডি স্ট্রীটলের সমর্থন করা। তিনি ট্রাসের সপক্ষে রায় দেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে চন্দ্রকান্ত বাবু আপিল করেন। এই আপিলের মামলা চালাবার জন্য কয়েকজন কিরকাডিকে নিয়ে একটি 'বেঞ্চ' গঠিত হয়। কিরকাডি আপিলেরই সুযোগ্যতমা ছিলেন এই বেঞ্চের সভাপতি।

সমস্ত মামলাটির খরচীয় নথিপত্র আগেভাগেই খুঁটিয়ে দেখেন যে চন্দ্রকান্ত ঘোষের আপিল গ্রাহ্য হয়। অবশেষে কিরকাডি সুযোগ্যতমা সকল প্রকার ইয়র্কশায়ারেই ট্রাসের বিপক্ষে রায় দিলেন। শহরের দেশীয় অধিবাসীদের

তাঁর এই রায় কিরে উল্লাস প্রকাশ করলেন। সেই কিরে তিনি বলেছিলেন যে, শহর উন্নয়নের নামে ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্ট অনেক গরীব ও অবহেলিত লোককে, গৃহহীন করেন – ক্ষতিপূরণ বাবদ যা দেওয়া হয় তাদের তাতে ঐ শক্তি ফুরাবার খুবই সামান্য। অনেকক্ষেত্রেই ট্রাস্টের ব্যয়বরাদ্দ প্রকাশ পায় না সবং গরিবরা তার বিরুদ্ধে লড়তে পারেনা। ট্রাস্টের অর্থবল ও প্রতিপত্তি বিরোধে চন্দ্রবাবুকে তাঁর প্রেসনে বিরুদ্ধে উচ্ছেদ করবার জন্য নিযুক্ত হয়েছিল, কিন্তু তাঁরা তাঁর সর্বনাশ উদ্দেশ্য করেছিলেন তা কিরাপতি আজকেরই।

এই রায়ের বিরুদ্ধে ট্রাস্টের পক্ষ থেকে লন্ডনে প্রিভি কাউন্সিলে আপিল করা হয়। সেখানে অবশ্য কিরাপতি অনুকূলে রায় দান করা বহাল থাকেনা। ট্রাস্টের পক্ষ থেকে তখন আর কোন যুক্তি না পেয়ে বলা হয়েছিল যে, যদি কিরাপতি অনুকূলে রায় বহাল থাকে তবে তিনি বড়বাজারের সমস্ত দালান ভেঙে যাবে। কারণের সংবাদপত্র অনুযোগের কিন্তু এই আপিলের প্রিভি কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত জানতে পারেনি; তাঁদের কাছে আজকেরই রায়ই যথার্থ বলে প্রতীয়মান হয়েছিল।

আজকেরই অবস্থানটি করা হাইকোর্টের ইতিহাসে নজিরস্বরূপ হয়ে থাকবে। কিরাপতি বলে যে পার্থক্য, যে প্রকার দৃষ্টি আর দায়িত্বজ্ঞানের প্রতি তাঁরা জোর দিয়েছিলেন, তা সত্যিই অনুকরণীয়। ১৯৩৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর আজকের হাইকোর্টের দায়রা থেকে অবসর গ্রহণ করেন।

—

।। সাত ।।

এইবার শিক্ষাব্রতী আশুতোষের কথা বলব।

তাঁর প্রতিভার পূর্ণ পরিচয় আছে তাঁর কর্মজীবনের এই ক্ষেত্রে।

স্যাডলার কমিশনের চেয়ারম্যান স্যর মাইকেল স্যাডলার আশুতোষ সম্পর্কে বলেছিলেন – 'একটি সাম্রাজ্য শাসনের প্রতিভা ছিল যার আশুতোষের। এই প্রতিভাকে তিনি উচ্চশিক্ষার বিস্তার সাধনে প্রয়োগ করেছিলেন।'

এই কথাটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য।

প্রাক্‌-ঔপনিবেশিক বিদ্যাঅভ্যাসের পর বাংলার শিক্ষা-ক্ষেত্রে, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে এতবড়ো প্রতিভা আর কখনো দেখা যায়নি।

space

১৯০৫।

এই বছর আশুতোষ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিযুক্ত হন। যেন এই সম্ভাবিত পদ অধিকারের জন্যই তাঁর মতো যোগ্যতম ব্যক্তিকেই এই পদের জন্য নির্বাচিত করা হল। উপাচার্যরূপে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে যে যুগান্তর এনেছিলেন তার কথার আগে, এই শিক্ষাব্রতীর সম্বন্ধে দুটি কথা বলা দরকার।

১৮৫৭ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তখন এখানে পঠন-পাঠনের কোনো ব্যবস্থাই ছিলনা। এটি ছিল শুধুই পরীক্ষা গ্রহণের আর উপাধি বিতরণের একটি প্রতিষ্ঠান। ১৯০৪ সালের আগে পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়

নামেই শুধু বিশ্ববিদ্যালয় ছিল, আসলে এটা ছিল একটি পরীক্ষাগার মাত্র। এই পরিপ্রেক্ষিতে পরীক্ষা-সম্পর্কে আইন-কানুন, যারা পরীক্ষা দেবে তাদের নাম, বয়স, সংখ্যা, কোন্ স্কুল বা কলেজ থেকে কোন্ পরীক্ষা দেওয়া হবে, তার সময়ের সারণিকরণ, প্রশ্নপত্র প্রস্তুত করা ও তা ছাপানো, খাতাপত্র নিয়ে ইত্যাদি পরীক্ষা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় সম্পাদিত হলে এবং সেসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করতেন।

যে উদ্দেশ্যে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল সেটি এইভাবে ব্যক্ত করা হয়: 'Advancement of Learning' অর্থাৎ, জ্ঞানের সম্প্রসারণ। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সেটি হলো 'ডিগ্রী' বা নম্বর। কিন্তু স্থাপিত হওয়ার প্রায় পঞ্চাশ বছর কাল পর্যন্ত এই নম্বর-সর্বস্বতা বিদেশী রোগে কেউ ধরে নি। ততদিন পর্যন্ত শুধু পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ছাত্রদের ডিগ্রী আর তাদের দিয়ে পরিচয় দান হতো। কারুর একজনের কারু সম্পর্কে মন্তব্য (Commendation) হলে, বড়জোর আদালতে ব্যারিস্টার হিসাবে। সেরেস্তার, যাকে বলা হতো কেরানির বাড়ীতে অবশ্য এইসব কাজ হতো।

পুরনো সেসব শর্তের এখন আর নেই।

এখানে এখন একটি নতুন দপ্তর করা বাড়ি তৈরি হয়েছে।

পুরনো সেসব শর্তের পাশেই ছিল আর্কিবল্ডের দপ্তর। নামেই বিশ্ববিদ্যালয়, আসলে অনেকটা বিশ্ববিদ্যালয় ওখান একটি পরীক্ষাগার ছিল আর কিছুই ছিলনা। একজন রেজিস্ট্রার, একজন সহকারী রেজিস্ট্রার

আর দিশাবোধ ছেড়ানি — এই নিয়েই অ্যাবর এই বিশ্ববিদ্যালয়। হত
নাই হতে চ্যান্সেলার, আর একজন উপাচার্য রাজনীতি হলে অইয়া-আসা
ছেলে-সিন্ডিকেটের সদস্যদের মধ্যে বিশিষ্ট দেশীয় ব্যক্তিগণ হলে ছেলে
বাংলার অন্যতম শিক্ষাবিদ বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ার
ছেলে ছেলেই ঘর মতই অনুষ্ঠিই ছিলেন। আর সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্য
ছিলেন দেশ বরেণ্য ও কলেজের পরীক্ষকও ছিলেন। আইনজ্ঞগণই অধিকাংশ
তাঁর দীনের শেষবারে সিন্ডিকেটের অন্যান্য সদস্য নির্বাচিত করেছিলেন।
তবুও আপত্তিই কথা সবেমাত্র সিন্ডিকেটে ঢুকেছে।

আজকালের আগে যে বরণীয় ও বরণীয় কথাগুলি সকল
বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলে ধরেছিলে দীক্ষান্তের ঠিক কিন
আর সম্বন্ধনা বক্তৃতাগুলি। স্বাধীন সালে ইনি ছেলেটের সদস্য নির্বাচিত
হন ও ফুল্ল সময় তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীন সালে তিনি সিন্ডি-
কেটের সদস্য নির্বাচিত হন ও পাঁচবছর এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। স্বাধীন সালে
তিনি উপাচার্যের পদ। তাঁর আগে আর কেহে বরণীয় এই পদ
গ্রহণ করেন নি। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতিকল্পে ও বাস্তবিক নিয়া
ছেলেটের আর ছেলেদের দান অনেক। তিনি সাতেই সাল পর্যন্ত উপাচার্যের
পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

সাত সালে তাঁর বয়সের বড়াই। তাঁর সময়েই বয়স্কদের
বিশ্ববিদ্যালয়ভুক্তি (তাঁর এই ছেলে অনেকের ছেলেই ও কাজের এই তিনি

'বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা' সম্পর্কে কোন ব্যবস্থার জন্য একটি কমিশন গঠিত হয়। এর আগে ১৮৭৭ সালে লর্ড রিপনের সময়ে এরকম একটি কমিশন গঠিত হয়েছিল।

রিপন কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে, তখন সংলগ্ন প্রদেশ মোট বাংলা প্রদেশ বলতে বাংলা, বিহার ও উড়িশাকে বোঝাত। শিক্ষিতের হার ছিল শতকরা ৩। ওয়ার্ড লর্ড কার্জন তাঁর প্রথম মন্ত্রীসভার বৈঠকে বলেন: 'বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ কেবলমাত্র পরীক্ষা নেওয়া আর ডিগ্রী দেওয়া নয়'— দেশে উচ্চশিক্ষা বিস্তারের জন্য তখনকার বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপরই বিশেষ দায়িত্ব ন্যস্ত। তিনি যে কমিশন বসিয়েছিলেন তার চেয়ারম্যান ছিলেন ইংলন্ডের সিভিল সার্ভিস ও অন্যান্য পদস্থ ডক্টর টমাস র‍্যালে। এই এই কমিশনকে বলা হয় 'র‍্যালে কমিশন।'

এই র‍্যালে কমিশনের অন্যতম সদস্য ছিলেন স্যর গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর অনেকের বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে প্রতিনিধিত্বের প্রয়োজন ছিল। র‍্যালে কমিশনের রিপোর্টের ফলেই ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির আমূল সংস্কার সাধিত হয়। ১৯০৪ সালে নতুন আইন বিধিবদ্ধ [redacted] হয়। এই আইনই 'The Universities Act, 1904' নামে পরিচিত। এই আইনের ভিত্তিতেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিবর্তন আসে। আগে যেখানে শুধু পরীক্ষা নেওয়া আর 'ডিগ্রী' দেওয়া হত, সেখানে এখন থেকে শিক্ষা-দানের ব্যবস্থা হলো।

#Space#

নতুন আইন পাস হওয়ার দু'বছর পরে, ১৯৫৩ সালে, মার্কিন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ-চ্যান্সেলর হওয়ার জন্য তাঁকে আমন্ত্রণ করেন। আইনস্টাইন সেই অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। উপাচার্য হওয়ার পর তাঁর প্রথম কাজ হলো নতুন বিধিব্যবস্থা বা 'New Regulations' তৈরি করা। এই নথিটি তৈরি করার সময়ে তিনি যে শ্রমিকের পরিচয় দিয়েছিলেন তার তুলনা নেই।

বিশ্ববিদ্যালয়কে তিনি তাঁর স্বপ্ননানুযায়ী রূপ দেবার স্থির করলেন। সেইজন্য সিদ্ধান্তের পরিচালনার উদ্দেশ্যে নতুন আইনকানুন রচনার তিনি অযোগ্য দূরদর্শিতার পরিচয় দিয়েছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ বিশ্ববিদ্যালয়-গুলির পরিচালনাবিধি আলোচনা করার সময়ে তিনি লক্ষ্য করেন। তাই এই কাজটি তাঁর পক্ষে খুব কঠিন হয়নি। কিন্তু তাঁকে অনেক বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। এই নতুন নিয়মাবলীর খসড়া আলোচনার জন্য যখন সিন্ডিকেটে উপস্থাপিত হয় তখন যে কি বিরুদ্ধ সমালোচনা! প্রত্যেকটি নিয়মের বিরোধিতা করে এক-একজন সদস্য বক্তৃতা করেন। এঁদের মধ্যে অধ্যাপক ইংরেজও ছিলেন।

সকলের মুখপাত্র ছিলেন ৩ জনা। তাঁরা উত্তেজনার মুখে অনেক কিছু বলে ফেলেন। যা উপাচার্য মহাশয়ের পক্ষে অপমানজনক। চার-পাঁচজনের কথা শুনে, তিনি বিরক্তি বোধ করেন। আলোচনা-সভায় নিয়মাবলীর দোষ-ত্রুটি দেখিয়ে এক-একজন সদস্য বক্তৃতা করেন। তিনি ধীরভাবে সব শুনেন, কোনো কথা বলেন

জাতীয় পরিষদ দিয়ে বিরোধীদলের অনুপস্থিতি যেন কোনো ক্ষেত্রে অংশ
টুকে নিবেদন। এইভাবে একাদিক্রমে সাত দিন ধরে মিশ্রিকেটের এই
অধিবেশন চলেছিল। প্রতিদিনই দেখা যেত, বিরুদ্ধ সমালোচনার উত্তরে
আন্তজেথকে খুব লম্বা বক্তৃতা করতে হতো না — দশ মিনিট বড়জোর
পনেরো মিনিট, এর বেশি বলার প্রয়োজন হতো না। যেটুকু বলতেন তার
অর্ধেক যাবতীয় অভিযোগ খণ্ডনে যুক্তি এবং তথ্যের নিখুঁত সমাবেশ। তাই প্রথম
দুদিনের মধ্যে বিরোধীদলের বক্তব্যের ভিত্তি ধ্বসে যেত।

একদিন।

একদিন বিকেল চারটে থেকে রাত সাড়ে দশটা পর্যন্ত মিশ্রিকেটের
বিতর্ক চলে। সেদিন অনেকেই ভেবেছিলেন, আজ আন্তজেথের পরাজয়
সুনিশ্চিত। সেদিনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা অন্য সব দিনের চেয়ে যেন একটু বেশি
তীব্র; তখন কি শুধু ফজদাস পর্যন্ত আন্তজেথের বিরোধিতা করে বক্তৃতা
দিলেন। যেন রাত সাড়ে, বিরোধীদলের বক্তব্য সবে শেষ হয়েছে। এইবার
উঠলেন আন্তজেথ। সেদিনকার [illegible] প্রত্যক্ষদর্শী ছিলেন, তখন তখন
বিশিষ্ট ভঙ্গি এই প্রসঙ্গে লিখেছেন:

'দেখতে আন্তজেথ উঠলেন। তাঁর হাতে সবচেয়ে বিখ্যাত
ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের স্যালেঞ্জার। তিনি একবার চোখ বুলিয়ে
নিলেন। বহু বছর পূর্বে এই সম্মান নিয়ে প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে
সেই বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যাবলীর ওপর আন্দোলন হইয়াছিল। কলিকাতা

বিশ্ববিদ্যালয়ের সদস্যরাও সেই যুক্তিটি অবলম্বন করিয়া প্রতিবাদ করিয়াছিলেন ও বলিয়াছিলেন যে, এরূপ নিয়ম প্রবর্তিত হইলে বড়ো প্রফেসারের নিন্দা হইবে; আশ্চর্যের বিষয় এই ব্যবস্থাপকসভার পাতার পর পাতা উল্টাইয়া বহু বৎসর পরের প্রসিডিং বিবরণীর অংশটি পড়িলাম। তখনো লিখিত ছিল: 'এই নিয়ম প্রবর্তিত হওয়ার সময় যাঁহারা ইহার বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়া [redacted] বলিয়াছিলেন যে, এই নিয়ম কার্যকরী হইবেনা, নিন্দা হইবে, তাঁহাদের ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়াছে। এখন তাঁহাদের বহু বৎসরের অভিজ্ঞতা দ্বারা পরীক্ষিত হইয়াছে যে, এই নিয়মাবলী খুব হিতকর এবং ইহা সন্তোষজনক ভাবে কার্য হইয়াছে।' সুতরাং এ বিষয়ে অধিক নিষ্প্রয়োজন।

এর পর আর কেহই বিরোধিতা করতে সাহস পেলেন না।

সর্বসম্মতিক্রমে নতুন নিয়মাবলী গৃহীত হলো।

আশুতোষের তৈরি এই New Regulations-ই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়কে এগিয়ে দিয়েছে সাম্রাজ্যের পথে। এইজন্যই তাঁকে বলা হয়েছে: 'বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিধাতাপুরুষ।' এই গৌরব তাঁর সর্বাংশে প্রাপ্য।

#space#

বিরাট কর্মীপুরুষ আশুতোষ।

একবার তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের নতুন করে গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। পরিদিন হাইকোর্ট থেকে বিকেল চারটের সময় তিনি বেরিয়ে যাইতেন তাদের আর কাজ আটটা পর্যন্ত একনাগাড়ে করে যেতেন। কখনো

যোগেশদির এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয়েছে বলে জানা নেই। একদিকে আশুতোষ আর অন্যদিকে বিশ্ববিদ্যালয় — এই দুটি যেন সমার্থক হয়ে গিয়েছিল — সমস্ত প্রকার দরদ ঢেলে তিনি শিক্ষাব্রতের সেবায় নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন যোগিন।

আশুতোষ যেভাবে তাঁর কল্পনাকে রূপ দিতে চলে কেবলমাত্র মিলেই হাউস যথেষ্ট নয় — বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্যের বৃদ্ধি করা দরকার। তিনি এর অনুমতি হওয়ার পর, দেখতে দেখতে নবপর্যায়ে বিশ্ববিদ্যালয় ধরে ধরে নতুন শ্রী, নতুন রূপ। নতুন এবং বিরাট রূপ। উঠে গেল সেনেটের হিসেবে হেয়ারস্কুলের সেই আরবাবুর বাজার। তৈরি হলো সেখানে সুদৃশ্য পাঁচতলা একটি হর্ম্য — দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিংস। দ্বারভাঙ্গার মহারাজার অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়। আশুতোষের অনুরোধেই মহারাজা এই টাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দান করেছিলেন।

এটা তো গেল বাইরের রূপ।

আর দিকে আশুতোষ উচ্চশিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। মুখ্যত আশুতোষের বিভাগ। যা আগে ছিলনা, তা চালু হলো। সমস্ত কলেজ থেকে উচ্চ. ম. ক্লাস উঠিয়ে দেওয়া হলো। একমাত্র বিশ্ববিদ্যালয় হয়ে উঠল উচ্চশিক্ষার কেন্দ্র — হয়ে উঠল জ্ঞান-বিজ্ঞান শিক্ষার এক বিরাট যজ্ঞশালা। সেই যজ্ঞশালার হোতা ছিলেন স্বয়ংই। তিনি আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ওঁ জবাকুসুম সঙ্কাশং — এই বলে তিনি আহুতি দিতেন যজ্ঞে। ১৯০৪ থেকে

১৯১৪— এই আট বছর কাল উঁকেই দেখেন, তাঁকে প্রতিষ্ঠা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি বিভাগ এক অভিনব শ্রী ধারণ করল। যেন এক যাদুকরের যাদুদণ্ড স্পর্শে ঘটে গেল এই অলৌকিক, অবশ্যম্ভাবী ঘটনা।

এই আমার্ত্য সাধন করতে গিয়ে আশুতোষকে তাঁর ব্যক্তিগত [illegible], পারিবারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের চিন্তা — সব কিছুই এই সময় বিসর্জন করতে হয়েছিল। একথা নিঃসন্দেহে যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজে তাঁকে প্রত্যেকের নিঃস্বার্থভাবে একান্ত সচেষ্ট হতে হয়েছিল।

১৯০৭।

উপাচার্য রূপে আশুতোষ তাঁর প্রথম সমাবর্তন বক্তৃতা দিলেন। মূল বক্তব্যটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কেরকাগুলি আমার মনে, এবং অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের দাবিতে সরকারি, যেই বিষয়টি তিনি সুন্দরভাবে আলোচনা করলেন। তারপর তিনি ছাত্রসমাজের পক্ষে স্বাধীন নিয়মানুবর্তিতার (discipline) প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে বললেন, 'সমস্ত বিদ্যালয়ে মুখস্থ শিক্ষা দান করতে হবে, পুঁথিগত বিদ্যা অর্জন করতে হবে।' স্কুলের কর্তৃপক্ষদের উদ্দেশ করে তিনি আক্ষেপ করে একথাটি বলেছিলেন, তা বোধহয় বোঝাবার আলো অপেক্ষা রাখে না।

উচ্চশিক্ষা লাভ করে ছাত্ররা যাতে বিলাসী জীবনযাপন না করে এই বিষয়ে তাদের সতর্ক করে দিয়ে, আশুতোষ আর একটি সুন্দর কথা বলেছিলেন তাদের। 'নিজেদের মর্যাদা রক্ষার জন্য নিজেদের অবস্থার বিরুদ্ধে যাবেন না।' আরো বলেছিলেন: 'তোমাদের পোশাক-পরিচ্ছদ, কথা-বার্তা

সমসাময়িক আবহে সবকিছু যেন ইথ্য সহ প্রকাশ না পাওয়া। যেমনি ইংরেজি
ভাষা শিখতে হলে বিজ্ঞানকে বাদ দিয়ে সর্বোচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত বাংলা ভাষায় পড়াশোনা করতে
বিরত হবে না। সর্বোচ্চ মাধ্যমিক বিজ্ঞানের বিকাশিত হবেনা।

যারা সদ্য স্নাতক হয়েছিল তাদের উদ্দেশ্যে করে তাঁরা এই
বক্তব্য বলেছিলেন: 'যে আমার ছাত্রনেতৃবৃন্দ, তোমরা কি সত্যই এ দেশের
সমাজের উপযোগী করতে পারছ?... তোমাদের কথাটা ভাব এই যে বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধির মূল তোমরা ঘটাও বলে, কার্যক্ষেত্রে তোমরা তার সঙ্গে
মিল দিতে পারো। তাহলেই যে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা দিয়ে তোমাদের নানান
দান করেছে, তার গৌরব ও মূল্য বৃদ্ধি পাবে।'

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে এই ১৯৫৮ সালেই ঢাকা বিশ্ব-
বিদ্যালয়ের পঞ্চাশবর্ষ দীর্ঘ উপলক্ষে সুবর্ণ-জয়ন্তী উৎসব হয়েছিল। এই উৎসব
আর সমাবর্তন অনুষ্ঠান একই সঙ্গে উদ্‌যাপিত হয়েছিল।

#Space#

প্রাক্তনদিনের মধ্যেই উপাচার্যরূপে আসতেই তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের
প্রভূত উন্নতিসূচক কর্মকাণ্ডের সূচনা করলেন। শিক্ষক, বিজ্ঞান ও অধ্যাপকের
পদোন্নতি - এই তিনটি বিষয় ছিল তাঁর কার্যক্রম। উপাচার্য ও উপাচার্য
এর তিনি নিজেই সংজ্ঞা করেছিলেন। একাধিক বিজ্ঞান ও বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি
কার্যানুষ্ঠান তিনি লাভ করেছিলেন। যৌবনে তিনি যাঁর অধীনে শিক্ষানবিশী
করেন তাঁকেই আবার করেছিলেন তাঁর সহযোগী রূপে আর তাঁরপর

প্রথমতে ব্যারিস্টার সুর তার কলমের খালির লক্ষ লক্ষ টাকার বেতন আজীবন হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১ চুড়ু, অযোধ্যার রাজা, ভারতশীর অজাতশত্রু, শোনপুরের মহারাজা, দিনাজপুর ও বিষ্ণুপুরের শেরপুরের কর্মিমাত্র প্রভৃতি অনেক বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তি, আজকেরির আহ্বানে, অকুণ্ঠিত অর্থদান করেছিলেন যেদিন। এইভাবে বিশ্বকোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের পাকা সড়ক হয়েছিল উচ্চ শিক্ষার্থীদের তার দায়িত্ব মহাবাজাদের অর্পণ করা।

আজকেরি তেন আদুকরের মাদুদণ্ড দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়কে স্পর্শ করেছিলেন। দেশের বলত, তাঁর হাতে ছিল আলাদিনের আশ্চর্য প্রদীপ। সত্যি তাই। দেখতে দেখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা-বিভাগের চারদিক ছেয়ে গেল। তার সীমার সংখ্যা নেই। নব কলাভবনের এই শিক্ষামন্দির তেন সত্যই জ্ঞানের পাখা সন্ধানের কর্মীদের ডাক দিল। আজকেরির কলা-বিভাগের কৃতিত্ব বিষয়ের পঠন-পাঠন করে হয়ে উঠেছিল প্রথম। সমস্ত আজকেরি দেশ-বিদেশ থেকে কাব্যরা অধ্যাপকদের বেতন দিয়ে নিয়ে আসতে লাগল।

১৯১৪ সালে আজকেরির কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য স্থাপিত হয় ইউনিভার্সিটি সায়েন্স কলেজ। এটা সম্ভব হয়েছিল পালিত ও তোষণীর বিপুল দানে। এই বিজ্ঞান-কলেজের প্রথম দুজন অধ্যাপক নিযুক্ত হয়েছিলেন রমণযুগে আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় এবং আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু। এই মানুষকে সরকারী চাকরি থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক করেছিলেন আজকেরি। এই বিজ্ঞান-কলেজের গবেষণাগারে গবেষণা

করেই বিজয়ী রাজন পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার লাভ করে রাতারাতি
বিখ্যাত হয়েছিলেন। রাজনের মতো এই প্রতিভা ছিল সেই আমলেই দুর্লভ।

এমনি করে আরো অনেক ছাত্রের মতো রাজনকেও শিক্ষা নিতে হয়েছে।
বাংলা ও বিদেশের প্রাচীনতম শিক্ষার ব্যবস্থা বাদ দিলে, ইংলণ্ড, জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি, রাশিয়া, জাপান প্রভৃতি দূর-দূরান্ত দেশ থেকে অনেক ব্যবসায়ী পণ্ডিতদের আসতেই সেখানে আমন্ত্রণ করে নিয়ে যাচ্ছিল বহুকাল ধরে। ইংলণ্ডের অক্সফোর্ড, রোমের খ্রীষ্টান, স্পেনের মুসলিম ও গ্রীসের পাদ্রী-মোল্লা প্রধান ছিলেন; আঠারোশতকের আরম্ভে দুই নতুন ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি করেছেন — একে দেশের বড় পণ্ডিত সরকার অধ্যাপক বলে আর করে নিয়েছেন। ফিনি (এঁদের) এই মহাবীর্য সমস্ত বিশ্বকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সেখানেই বিশ্ব-সৃষ্টি করলেন এক নালন্দা। গড়ে তুললেন এক বিশাল সারস্বত-মণ্ডল।

বিশ্বের অন্যান্য সেই বিশ্ববিদ্যালয়গুলো স্বীকৃতি পেয়ে অনেকগুলো বিশ্ব-বিদ্যালয়। তাদের অনুকরণে নিজের ভাষা ও ভাষায় নির্মল করে নিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের মুক্ত পরিবেশ। আজকের পৃথিবী দেখবার আগেই তাঁর মহাপ্রয়াণ ঘটে। তাঁর এই মহতী কর্মের কথা মনে করেই বুঝি বাংলার কবি লিখেছেন:

'যিনি রেখেছ বাংলার এই বিশ্ববিদ্যালয়,
নব-পথিকের জীবন-যজ্ঞ আজিকার অভ্যর্থনা।'